বিশ্বসেরা দুটি কিশোর গল্প

www.alorpathsala.org

আলোর পাঠশালা

School of Enlightenment

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

আলোকিত মানুষ চাই

বিশ্বসেরা দুটি কিশোর গল্প

হ্যামিলনের বাঁশিঅলা

রিপ ভ্যান উইঙ্কল

সম্পাদনা ॥ আহমাদ মাযহার

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৯৬

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪১১ জানুয়ারি ২০০৫

তৃতীয় সংস্করণ সপ্তম মুদ্রণ
চৈত্র ১৪১৮ এপ্রিল ২০১২

প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অলঙ্করণ
দুই বিদেশি শিল্পীর ছবি অবলম্বনে

মূল্য
আশি টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0195-7

গল্প শুরুর আগে

কয়েক শো বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদ্ভব হলেও এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত বিশ্বসেরা দুটি গল্পই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন জার্মান ইতিহাস ও লোক-সংস্কৃতি থেকে উপাদান নিয়ে। প্রথম গল্প *হ্যামিলনের বাঁশিঅলার* উদ্ভব সরাসরি জার্মানিতে আর *রিপ ভ্যান উইঙ্কল*-এর সৃষ্টি আমেরিকার ন্যুইয়র্কে। দুটি দেশের ব্যবধান কয়েক হাজার মাইলের; গল্প দুটির সৃষ্টিকালের ব্যবধানও কয়েক শো বছরের। কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিক থেকে উভয়ের উৎসভূমি এক। এর কারণ ভৌগোলিক।

এক সময় নেদারল্যান্ড ছিল জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সেই সূত্রে নেদারল্যান্ডের অধিবাসীরা বৃহত্তর জার্মান সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাসিন্দা। নেদারল্যান্ড থেকে কিছু মানুষ গিয়ে বসতি গড়েছিল ন্যুইয়র্কে। প্রধানত তারাই গড়ে তুলেছে ন্যুইয়র্ক রাজ্য। সুতরাং ন্যুইয়র্কও হয়ে উঠেছে জার্মান সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। *রিপ ভ্যান উইঙ্কল* গল্পটি অভিবাসী ওলন্দাজদের চৈতন্যের গভীরে স্থান পাওয়া জার্মান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিচূর্ণিত উপাদানে ভরপুর। আর *হ্যামিলনের বাঁশিঅলার* উদ্ভব খোদ

জার্মানিতে বলে এটাকে সরাসরি জার্মানির গল্পই বলতে হবে। যদিও কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর কবিতার মধ্য দিয়ে গল্পটি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। বাংলাদেশের মানুষ প্রধানত ব্রাউনিং-এর মাধ্যমেই জানতে পেরেছিল গল্পটির সম্পর্কে।

২

হ্যামিলনের বাঁশিঅলার কথা

এই গল্পটি জার্মানির একটি কিংবদন্তিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। জার্মানি যখন দুটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে বিভক্ত ছিল তখন হ্যামেলিন শহর ছিল পশ্চিম জার্মানির অন্তর্ভুক্ত। বাংলাভাষায় এই শহরকে অনেকেই 'হ্যামিলন' বলেন। ওয়েসার নামে একটা নদী আছে হ্যামেলিন শহরে। কিংবদন্তির এই গল্পটার উদ্ভব ষোড়শ শতকে বলে ধারণা করা হয়। ১২৮৪ সালে ঐ শহরের বিপুল সংখ্যক শিশুর ভাগ্যে করুণ পরিণতি ঘটেছিল। ঐ ঘটনা থেকে কিংবদন্তিটির জন্ম। তবে জার্মানিতে এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মহাপ্রস্থানের ঘটনাটি পূর্বাঞ্চলে জার্মান উপনিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ক্রুসেডের যুগে ১২১২ সালে কোলনের নিকোলাসের নেতৃত্বে হাজার হাজার ছেলেমেয়ের একটা দল বিরাট একটা অভিযানে গিয়ে করুণ পরিণতি বরণ করেছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল যে তারা অলৌকিকভাবে বিনা-যুদ্ধেই তাদের পবিত্রভূমি পুনরুদ্ধার করতে পারবে। আর-একটি কিংবদন্তি আছে স্টিফেন নামে এক মেষপালককে নিয়ে। তার নেতৃত্বে ফ্রান্স থেকে বিপুলসংখ্যক কিশোর ঘর ছেড়েছিল। স্টিফেন বলেছিল যে তারা পায়ের জুতো না ভিজিয়েই সমুদ্র পার হয়ে যেতে পারবে। কোনো কোনো কিংবদন্তিতে অবশ্য আছে যে ছেলেমেয়ের দলটা শেষপর্যন্ত ভেঙে গিয়েছিল। তারা নিরাপদেই ফিরে এসেছিল বাবা-মায়ের কাছে ।

জার্মানির কোলনের অধিবাসী নিকোলাস নামের ছেলেটিকে নিয়ে যে-কাহিনী প্রচলিত আছে তাতে বলা হয়েছে ছেলেটি আনুমানিক ২০,০০০ ছেলেমেয়ের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাদের বেশির ভাগই ছিল দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ঘরের। এরা বেরিয়ে এসেছিল অসৎ লোকেদের পাল্লায় পড়ে। আল্পস পর্বতমালা দিয়ে ইতালি পার হয়ে জেনোয়া পর্যন্ত আসতে পেরেছিল তাদের অনেকে। যখন টের পেল যে সমুদ্র তাদের যাত্রাপথ খুলে দেয়নি তখন তারা ভাগ হয়ে গিয়েছিল অনেকগুলো ছোট ছোট দলে। কেউ কেউ বাড়ি ফিরে আসতে পেরেছিল, কিন্তু অধিকাংশেরই বরণ করতে হয়েছিল দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি। কেউ কেউ পড়েছিল ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার দাসব্যবসায়ীদের খপ্পরে।

হ্যামেলিনের বাসিন্দারা দীর্ঘকাল এটিকে একটি সত্যি ঘটনা বলে বিশ্বাস করতেন। সন-তারিখ মিলিয়ে ঘটনাটিকে সত্যি প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন তাঁরা। হ্যামেলিন শহরে ইঁদুর-শিকারির বাসস্থান হিসেবে কল্পিত দুটি জাদুঘরও রয়েছে। বাড়ি দুটি দেখে ইঁদুর-শিকারির ঘটনা তো রীতিমতো বিশ্বাস্যই মনে হয়। ৪০০ বছরের পুরনো বিশাল এক প্রাসাদে খোদাই করা আছে ঐ ঘটনার তারিখ। সেই খোদাইলিপি অনুসারে তারিখটি ১২৮৪ সালের ২৬ জুন। কিংবদন্তিটি ওই শহরের সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। মাঝে মাঝে শহরের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে গল্পটি পাঠ করা হয় দিনটিকে স্মরণের জন্য।

অনেকে মনে করেন ১২৬০ সালে ঐ শহরের যুবকদের একটা বিপুল অংশ এক যুদ্ধে অংশ নিয়ে রণাঙ্গনেই মারা যায়। ফলে শহর প্রায় তরুণশূন্য হয়ে পড়েছিল। স্থানীয় একটা ঝগড়াকে কেন্দ্র করে 'সেডেলমন্ডের যুদ্ধ' নামে পরিচিত হয়েছিল এই যুদ্ধটি। আবার অনেকে মনে করেন চতুর্দশ শতকে একবার এক ভয়ঙ্কর প্লেগ রোগের আবির্ভাব ঘটেছিল। হ্যামেলিন শহরের বহু মানুষ এই রোগে প্রাণ হারান। ইঁদুরের দ্বারা ঐ ভয়াবহ রোগ ছড়িয়েছে বলে প্রথমে হাজার হাজার ইঁদুর মারা যায়। ইঁদুরের শরীর থেকে রোগটা ছড়িয়ে পড়েছিল মানুষের শরীরে। ঐ রোগে আক্রান্তরা মনে করত বাঁশির আওয়াজ শুনলে একটু আরাম পাওয়া যায়। পেশিতে টান ধরার প্রবণতা নাকি তাতে একটু কমত। সে-যুগে গানবাজনার দল মানুষকে সহানুভূতি জানাতে শহরে শহরে ঘুরে বেড়াত এই রকম একটা প্রথা ছিল। এই প্রথার মধ্যেও অনেকে বাঁশিঅলার প্রতীকের উৎস খুঁজে পান।

ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং তাঁর বহুবিখ্যাত *দি পায়িড পাইপার অব হ্যামেলিন* কবিতাটির মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এই গল্পটিকে। আমীরুল ইসলাম ঐ কাহিনী-কাব্যটিকে সরাসরি অনুবাদ করেন নি। ঐ কবিতায় বর্ণিত কাহিনীটির ঘটনাক্রমকে অনুসরণ করলেও সম্পূর্ণ নিজের ভাষায় স্বাধীনভাবে পুনর্কথন করেছেন।

বাংলাভাষায় এই কিংবদন্তিটি অনেক বিখ্যাত লেখকই কিশোর-পাঠকদের উপযোগী করে লিখেছেন। এ-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু এবং হায়াৎ মামুদের নাম করা যায়। আমীরুল ইসলাম নতুন করে তাঁর কল্পনাপ্রতিভা সমৃদ্ধ মনোমুগ্ধকর ভাষায় আবার লিখলেন নবীন পাঠকদের জন্য।

৩

রিপ ভ্যান উইঙ্কল ও ওয়াশিংটন আরভিং-এর কথা

কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সময়ের দায় মোচনের জন্য সারাজীবন যে-কাজ করেন তা হয়তো পরবর্তীকালে তত গুরুত্ব পায় না, পরিবর্তে

শাদামাঠাভাবে যে-কাজ করেন তার গুরুত্ব অনেক বেশি হয়ে পড়ে। অনেকটা এমনই ঘটেছে মার্কিন লেখক ওয়াশিংটন আরভিং-এর বেলায়। তিনি ছিলেন মূলত ইতিহাস-লেখক ও জীবনীকার। অথচ অন্যান্য ধরনের রচনার তুলনায় ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনেক বেশি স্মরণীয় হয়েছে। মার্কিনি জাতীয়তার নানা বৈশিষ্ট্য-অনুষঙ্গকে লেখক হিসেবে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি জাতীয়তাবোধসম্পন্ন মার্কিনিদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ছেলেবেলায় আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের জাতীয়তাবাদী তৎপরতা তাঁর চেতনাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। বাল্যকালে ন্যুইয়র্ক শহরের গঠমান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলিও ছিল তাঁর চেতনায় প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল।

পিতামাতার এগারো সন্তানের মধ্যে ওয়াশিংটন আরভিং ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। জন্ম ৩ এপ্রিল ১৭৮৩ সালে ন্যুইয়র্ক শহরে। তরুণ বয়সেই সাহিত্য ও নাট্যচর্চায় তাঁর আগ্রহ দেখা যায়। ঐ বয়সে রুগ্‌ণ আরভিংকে হাওয়া বদল করতে পাঠানো হয় স্বাস্থ্যের উন্নতির আশায়। সে-সময় প্রায় দুই বছর ধরে মার্কিন দেশের বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করেন আরভিং। ঐ রাজ্যগুলো তখন ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চাচ্ছিল। ভ্রমণ থেকে ফিরে তিনি আইনশাস্ত্র বিষয়ে অসমাপ্ত শিক্ষাজীবন শেষ করেন। তারপর যোগ দেন বার-এ। কিন্তু আইনব্যবসার চেয়ে ন্যুইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়ার সমাজ-জীবন নিয়ে লেখালেখিতেই বেশি আগ্রহ দেখা যায় তাঁর মধ্যে। ২৬ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই প্রকাশিত হয় জেমস কে পডলিং এবং উইলিয়াম আরভিং-এর যৌথভাবে রচিত সিরিজ-রচনা *সালামাগুন্ডি, অর দি হুইম হয়ামস অ্যান্ড লন্সেলট ল্যাংগসট্যাফ অ্যান্ড আদারস* এবং ডিয়েডরিক নিকারবকার ছদ্মনামে লেখা *হিস্ট্রি অব ন্যুইয়র্ক*। এইসব রচনায় রয়েছে ন্যুইয়র্কের রাজনীতি, ইতিহাস, সরকার ও জীবনযাত্রা ইত্যাদি সম্পর্কে বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ ও হাস্যরস। ঐ লেখাগুলো সমকালের খ্যাতিমান ইংরেজ লেখক ওয়াল্টার স্কট-এরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

১৮০৯ সালে বাগদত্তা স্ত্রী মাতিলদা হফম্যানের মৃত্যু হলে তিনি শোকে ভীষণ ভেঙে পড়েন। এই ঘটনার পরের কয়েক বছরে তাঁর কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম পাওয়া যায়নি। ১৮১২ সালে যুদ্ধের বছর তিনি নৌ-কম্যান্ড্যান্টদের জীবনী রচনা করেন। ঐ সময় ন্যুইয়র্কের গভর্নরের এইড ডি ক্যাম্প পদেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। পদটি ছিল কর্নেল পদমর্যাদার সমতুল্য। যুদ্ধের পর ১৮১৫ সালে আবার ইয়োরোপে পাড়ি জমান। সেখানে বসবাস করেন সতেরো বছর। ঐ সতেরো বছরে তিনি ইয়োরোপীয় মনোভাবাপন্ন একজন মানুষে পরিণত হন। ইংল্যান্ডে পৌঁছবার কিছুকালের মধ্যে তাঁদের পারিবারিক ব্যবসায় ভাটা পড়ে। ফলে বঞ্চিত হন পারিবারিক আর্থিক সহায়তা থেকে। সে-সময় তিনি প্রধানত লেখালেখির

ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। প্রচুরসংখ্যক প্রবন্ধ ও ছোটগল্প লেখেন তখন। প্রকাশিত হয় *দি স্কেচ বুক অব জেফ্রি ক্রেয়ন, জেন্ট* (১৮২০)। এই বইটিই তাঁকে ব্যাপকভাবে সুধীসমাজে পরিচিত করে তোলে। *ব্রেসব্রিজ হল* (১৮২২) এবং *টেলস অব ট্র্যাভেলর* (১৮২৪) বই দুটি প্রকাশিত হলে তাঁর খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ে।

১৮২৬ সালে ওয়াশিংটন আরভিং স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদস্থ মার্কিন দূতাবাসে চাকরি নেন। তখনই গ্রানাডার আলহামরার সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীরতর হয়। স্পেনীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তাঁকে এতটাই আলোড়িত করে যে তিনি কয়েকটি বই লিখে ফেলেন স্পেন সম্পর্কে। তিনি লেখেন *এ বায়োগ্রাফি অব কলাম্বাস* (১৮২৮), *দি কনকোয়েস্ট অব গ্রানাডা* (১৮২৯) এবং *দি আলহামরা : এ সিরিজ অব টেলস অ্যান্ড স্কেচেজ অব দ্য মুরস অ্যান্ড স্প্যানিয়ার্ডস* (১৮৩২)।

১৮২৯ থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডনে আমেরিকান অ্যাটাশে হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর আমেরিকায় ফিরে যান। ততদিনে তিনি আমেরিকার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেছেন। সম্মানিত মানুষ হিসেবে তিনি ঐ সময় আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তখনই সেখানকার জীবনযাত্রাভিত্তিক সাহিত্য রচনা করতে উদ্বুদ্ধ হন তিনি। *এ ট্যুর অন দ্য প্রেইরিজ* (১৮৩৫), *অ্যাসটেরিয়া* (১৮৩৬) এবং *দি অ্যাডভেঞ্চার অব ক্যাপটেন বোনভিল, ইউএসএ* (১৮৩৭) এই পটভূমিতেই রচিত। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত বইগুলো হচ্ছে : *অলিভার গোল্ডস্মিথ* (১৮৪৯), হযরত মুহম্মদ [স.] এবং তাঁর উত্তরসূরীদের সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দুইখণ্ড রচনা *ম্যাহামেট অ্যান্ড হিজ সকসেসরস* (১৮৪৯-৫০) এবং পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনচরিত। ১৮৫৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়াশিংটন আরভিং মার্কিন দেশে ও ইংরেজি-জানা দেশগুলোতে পরিচিত প্রধানত একজন গল্পকার হিসেবেই। ছোটগল্পের আদি লেখকদের তিনি অন্যতম। *রিপ ভ্যান উইঙ্কল* গল্পটি তাঁর *দি স্কেচ বুক অব জেফ্রি ক্রেয়ন, জেন্ট* বই থেকে নেয়া। এই গল্পটি গড়ে উঠেছে ন্যুইয়র্ক শহর যখন সবে গড়ে উঠছে সেই সময়ের একটি কিংবদন্তির ওপর ভিত্তি করে। আমেরিকার ন্যুইয়র্ক রাজ্যের আদি অধিবাসী ছিলেন ওলন্দাজরা। হাডসন উপত্যকায় তাঁদের মধ্যে জার্মান লোককথার প্রভাবে গড়ে ওঠা যে ধরনের কল্পকথা ছড়িয়ে ছিল তার আবহেই রচিত হয়েছে *রিপ ভ্যান উইঙ্কল* গল্পটি। কিন্তু এর সবকিছু ছাপিয়ে আঙ্গিক সংগঠনে ও রূপকের শক্তিতে গল্পটি অনন্যসাধারণ।

রিপ ভ্যান উইঙ্কল গল্পটি ওয়াশিংটন আরভিং লিখেছিলেন ডিয়েডরিক নিকারবকার ছদ্মনামে। এই ছদ্মনামটি গ্রহণের পেছনে একটা চমৎকার তাৎপর্য

আছে। আগেই বলা হয়েছে যে আরভিং ন্যুইয়র্কের ইতিহাস লিখেছিলেন এই ছদ্মনামে। *হিস্ট্রি অব্ ন্যুইয়র্ক* প্রথম যখন প্রকাশিত হয় তখন এর লেখককে নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমে জানানো হয়েছিল যে ন্যুইয়র্কের কলম্বিয়ান হোটেলের বৃদ্ধ এক ভাড়াটে হোটেল ছেড়ে চলে যাবার পর তাঁর ফেলে যাওয়া কাগজপত্রের মধ্যে *ন্যুইয়র্কের ইতিহাস* বইটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। পাণ্ডুলিপিটি ঐ হোটেল-মালিক প্রকাশনার উদ্দেশ্যে হস্তান্তরের আগে এর প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ফাঁস হয়ে গেল যে ডিয়েডরিক নিকারবকার বলে প্রকৃতপক্ষে কেউ নেই, এটি ওয়াশিংটন আরভিং-এরই লেখা। প্রথমে ন্যুইয়র্কবাসীরা তা বিশ্বাস করতে চাননি। তাদের মনে হয়েছিল একজন তরুণ অসফল আইনজীবী এ-রকম পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি ও উন্নত সাহিত্যগুণসম্পন্ন একটা বই লিখতেই পারেন না। পরে অবশ্য ঐ বইটার জন্যই ওয়াশিংটন আরভিং-এর সম্মান বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল। ন্যুইয়র্ক রাজ্যে যে জনবসতি গড়ে উঠেছিল তার সূচনা ঘটিয়েছিল হল্যান্ড থেকে আগত পুরনো একটা পরিবার। এই বইটাতেই প্রথমে এই তথ্যটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল। এমন রটনাও আছে যে ডিয়েডরিক নিকারবকার ঐ ঐতিহাসিক পরিবারেরই সন্তান। কারণ মি. নিকারবকারের বিভিন্ন রচনাতে ঐ পরিবারের কথা বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। *অ্যানালিটিক* নামে ফিলাডেলফিয়ার এক সাময়িকীর সম্পাদক হিসেবে স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতার পর কয়েক মাস সামরিক বাহিনীতে রোমাঞ্চপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেন আরভিং। সে সময়ই তাঁকে গভর্নর টমকিনের কর্নেল-এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ওটা ছিল যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ কাজ। *অ্যানালিটিক*-এ কাজ করার সময় তিনি কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন যেগুলো পরে তাঁর *স্কেচবুক*-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

ন্যুইয়র্কের প্রাচীন ইতিহাস মানেই ডাচ অভিবাসীদেরই ইতিহাস। সে-কারণেই ওয়াশিংটন আরভিং *ন্যুইয়র্কের ইতিহাস*-এর লেখকের নাম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ডিয়েডরিক নিকারবকার ছদ্মনাম। শুধু তাই নয়, এরপর থেকে আরো যাঁরা ন্যুইয়র্কের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে লেখালেখি করেছেন তাদেরও 'নিকারবকার লেখক' নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

ষোড়শ শতকে ছোট্ট একদল ডাচ জনবসতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ন্যুইয়র্ক রাজ্য। এরা বিশেষ করে বসতি স্থাপন করেছিল ম্যানহাটন দ্বীপে। ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, নিউ আমস্টাডার্ম-এর লোকেরা ছিল বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী। তারা এক ধরনের অদ্ভুত হাঁটুপর্যন্ত নেমে আসা প্যান্ট পরত। ঐ প্যান্টকে বলা হয় নিকারবকার। প্রাচীন ডাচ ন্যুইয়র্কবাসীদের উত্তরাধিকারীদেরও নিকারবকার বলা হয়। শুধু তাই নয়, এমনকি ন্যুইয়র্কবাসী মাত্রকেই নিকারবকার ডাকা যেতে পারে। এই থেকেই ন্যুইয়র্কবাসীদের আর-এক নাম হয়েছে 'ন্যুইয়র্ক নিকস'।

শুধু *ন্যুইয়র্কের ইতিহাসই* নয় ওয়াশিংটন আরভিং ডিয়েডরিক নিকারবকার নামে একজন কাল্পনিক লেখকের অবতারণা করেছেন যিনি তাঁর অন্য দুটি বিখ্যাত গল্প *দ্য লেজেন্ড অব স্লিপি হলো* এবং *দ্য হেডলেস হর্সম্যান*-এরও লেখক।

ডিয়েডরিক নিকারবকার রূপে ওয়াশিংটন আরভিং যা সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে য়োরোপের নানা বৈশিষ্ট্যের তুলনা করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে শনাক্ত করতে শুরু করেছিল মার্কিনিরা। ডিয়েডরিক নিকারবকার নামে তিনি যে-সব গল্প লিখেছেন সেগুলো প্রাচীন জার্মান লোককথার ওপর ভিত্তি করে। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, জার্মান লোককথা ভিত্তিক গল্পগুলোও প্রকাশিত হয়েছিল জিওফ্রে ক্রেয়ন ছদ্মনামে। বইটার নাম ছিল *দ্য স্কেচবুক অব জিওফ্রে ক্রেয়ন, জেন্ট*। ওয়াশিংটন আরভিং ডিয়েডরিক নিকারবকার নামেই প্রথম আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শান্তা ক্লজ-এর ইতিহাস লেখেন।

রিপভ্যান উইঙ্কল গল্পটির মূলপাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ইন্টারনেট সূত্রে প্রাপ্ত ব্র্যানডার ম্যাথিউস সম্পাদিত *দি শর্ট স্টোরি* (১৯০৭) সংকলনের ৪নং রচনাটি। ব্র্যানডার ম্যাথিউস (১৮৫২-১৯২৯) ছিলেন উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের একজন আমেরিকান প্রভাবশালী সাহিত্যসমালোচক ও পণ্ডিত। তাঁর সাহিত্যরুচি ছিল উন্নত। দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে মার্কিন ও ব্রিটিশ বেশ কয়েকজন লেখকের রচনাবলিও সম্পাদনা করেছেন তিনি।

ওয়াশিংটন আরভিং-এর এই বিখ্যাত গল্পটি নানা বইয়ে সংকলিত হলেও সাধারণত ডিয়েডরিক নিকারবকার নামে ওয়াশিংটন আরভিং যে ভূমিকা এবং পাদটীকা লিখেছিলেন তা অন্তর্ভুক্ত হয় না। সম্ভবত এ পর্যন্ত এই অংশ দুটি কোনো বাংলা অনুবাদেই অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই সংস্করণে অংশ দুটির অনুবাদ যোগ করা হল। আশা করি এ যুগের বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রাচীন জার্মান লোকঐতিহ্যসমৃদ্ধ এই অংশ দুটো আনন্দদায়ক মনে হবে।

৪

দুটি গল্পই আলাদাভাবে বই আকারে এক দশক আগে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন এক মলাটে বন্দি করে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নতুনভাবে প্রকাশ করছে চিরায়ত এই গল্প দুটিকে বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে সহজলভ্য করবার আশায়।

আহমাদ মাযহার
২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

সূচি

হ্যামিলনের বাঁশিঅলা
র্মান কিংবদন্তির পুনর্কথন
আমীরুল ইসলাম
পৃষ্ঠা- ১৫
রিপ ভ্যান উইঙ্কল
মূল : ওয়াশিংটন আরভিং
নুবাদ : আহমাদ মাযহার
পৃষ্ঠা- ৪৩

হ্যামিলনের বাঁশিঅলা

সে এক আশ্চর্য সুন্দর শহর।

নাম তার হ্যামিলন। শহরের পশ্চিমে বয়ে গেছে মায়ের শাড়ির আঁচলের মতো ঝলমলে এক নদী। নাম তার ওয়েসার। পূর্বে এক বিশাল পাহাড়। সারা শহরে ছোট বড় অনেক অনেক বাড়ি-ঘর। যেমন সুন্দর শহর তেমনই ভালো এই শহরের লোকগুলো।

সুখে-শান্তিতে বেশ ভালোই দিন কেটে যাচ্ছিল সবার।

কিন্তু হঠাৎ করেই ঘটল এক বিপত্তি। হ্যামিলন শহর ছেয়ে গেল ছোট বড় নানাপ্রকার ইঁদুরে। ইঁদুরের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল লোকজন! বিপদ মানে বিপদ—কেউ হয়তো বিছানা থেকে নেমেছে নিচে, অমনি পা পড়ল ইঁদুরের উপরে। কেউ হয়তো ঘুমিয়েছে রাতে—ইঁদুরের দল এসে বিছানা-বালিশ খেয়ে ফেলল কুটকুট করে। ঘরে ইঁদুর, বাইরে ইঁদুর। ইঁদুর কোথায় নেই! লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ইঁদুরের উৎপাত!

ইঁদুর ঘুরছে প্যান্ট-শ্যার্টের পকেটে। আলমারি-মিটসেফে বসবাস করছে ইঁদুর। মানুষের খাবারদাবার মুহূর্তেই সাবাড় করে ফেলছে তারা। ইঁদুরের অত্যাচারে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল হ্যামিলনের লোকজনের।

যেমন একদিন—একদল ইঁদুর মিলে আক্রমণ করে বসল পাগলা এক কুকুরকে। কুকুরটা প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। পেছনে পেছনে খ্যাপা ইঁদুরের দল।

বিড়াল দেখলে ইঁদুর পালায়। কিন্তু হ্যামিলনে ঘটল এর উল্টোটা। ইঁদুররা মিলে হুলো বেড়ালকে আক্রমণ করে মেরেই ফেলল। ঘটনাটা এমন হল, ইঁদুরের ভয়ে সিঁটিয়ে রইল পশু-প্রাণীরা। কুকুর আর বিড়াল পারলে সেই শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়!

হ্যামিলনের ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়েদের অবস্থা তখন কেমন হল একবার ভেবে দ্যাখো! তাদের খাবার খেয়ে ফেলছে ইঁদুরেরা। তাদের বিছানায় লাফালাফি করছে ধেড়ে ইঁদুরের দল। সারাক্ষণ ইঁদুরের কিচিকিচি কিচিকিচি ডাক। কান সবার ঝালাপালা।

কী দুঃসহ যন্ত্রণা!

ইঁদুরের জ্বালায় টেকা দায়। ঘরে থাকা যায় না। অফিসে, আদালতে, পার্কে, ইশকুলে—সবখানেই একই যন্ত্রণা! ইঁদুর ইঁদুর আর ইঁদুর।

হ্যামিলনের মানুষজনের চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেল। শান্তি চলে গেল। আতঙ্কে সবাই অস্থির। কী হবে এর পরিণতি? তাহলে চমৎকার হ্যামিলন কি বেদখল হয়ে যাবে ইঁদুরের হাতে?

লোকজন পাগলের মতো হয়ে গেল ইঁদুরের যন্ত্রণায়। কী করেই-বা এ-রকম অবস্থায় মানুষ বসবাস করতে পারে? নিরিবিলি এক মিনিট বসে থাকার জায়গা নেই সারা হ্যামিলনে! কিলবিল করে ইঁদুরের দল উঠে আসবে শরীরে। আঁচড় বসাবে, দাঁত খুঁটবে, চিঁ চিঁ করে ডাকতে থাকবে।

ভারি মুশকিল!

ভারি যন্ত্রণা!

এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কীভাবে?

শহরের গণ্যমান্য লোকেরা মিলে মিটিং-এ বসল। উপায় কিছু-একটা বের করতেই হবে। এভাবে দিন-দুনিয়া চলতে পারে না। ইঁদুরের উৎপাত থেকে রক্ষা করতে হবে হ্যামিলন শহরকে। একা একা কারো পক্ষে এই বিশাল ইঁদুরবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। মুক্তির পথ একটা বের করতেই হবে।

হ্যামিলন শহরের যিনি প্রধান, সেই মেয়র ঝিম মেরে বসে আছেন চেয়ারে। গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ তাঁর চোখেমুখে। কোটি কোটি ইঁদুরের বিরুদ্ধে লড়াই! এ কী রকম আশ্চর্য ব্যাপার!

মিটিং-এ উপস্থিত হয়েছে হ্যামিলনের সবাই। উৎকণ্ঠিত চেহারা তাদের। রাতে ঘুম হয় না কারো। দিনে খাবার জোটাতে পারে না কেউ। কারো মাথার ঠিক নেই। একজন তো ভিড়ের মধ্যে থেকে বলেই বসল : সমস্যা সমাধান না হলে মেয়রের মাথা ভেঙে ফেলা হবে।

মেয়র তখন মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারের হাতল ধরে বসে আছেন। কিছুই তাঁর বলার নেই। উত্তেজিত জনতার সামনে তিনি এখন কী-ই বা বলতে পারেন? তবু তাঁকে কিছু বলতে হবে।

কাঁপতে কাঁপতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হাতজোড় করে তিনি হ্যামিলনের অধিবাসীদের উদ্দেশে বলা শুরু করলেন :

আজ বড় দুর্দিন আমাদের। আপনাদের কষ্ট মানে সেটা আমারই কষ্ট। কী নিদারুণ এবং ঘোর দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যেই-না আমাদের দিন কাটছে! ইঁদুর অতিষ্ঠ করে তুলেছে আমাদের জীবন। আমরা সর্বদা ভীত। খুট করে একটু আওয়াজ হলেই আমার মনে হয় এই বুঝি তেড়ে এল ইঁদুরেরা। রক্ত হিম হয়ে আসে আমার। ইঁদুর যে এ-রকম দুঃসহ করে তুলতে পারে আমাদের জীবন, এ-কথা কে কবে কোথায় ভেবেছে বলুন?

আপনারা আমাকে দোষারোপ করছেন। স্বীকার করে নিচ্ছি সব দোষ আমার। সমাধানের পথ বের করতে বলছেন আমাকেই। আমি তো আপনাদেরই একজন। আপনারাই আমাকে পথ বলে দিন। নইলে ভেঙে ফেলুন আমার মাথা।

আমি তাহলে বেঁচে যাই। এ-রকম নির্মম কষ্ট সহ্য করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আমি পালিয়ে যেতে চাই এই শহর ছেড়ে ...

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন মেয়র। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তিনি। তাঁর চোখে বাঁধভাঙা অশ্রু। সভায় উপস্থিত লোকজনেরা একেবারে চুপ মেরে গেল। সবাই হতবাক। কারো মুখে কোনো কথা নেই। বিপদের দিনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুব প্রয়োজন। আজ কেউ তো আর প্রিয় এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে না।

ইঁদুরের হাত থেকে মুক্তির উপায় বের করতে হবে। মৌন নীরবতায় নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে সবাই। সবার মাথায় হাত।

ভাবছে সবাই।

গভীরভাবে ভাবনায় নিমগ্ন।

সমস্যা যখন তৈরি হয়—সমাধানের পথ তো একটা বের করতেই হবে তখন।

সভার কাজ চলতে চলতেই টের পাওয়া গেল, এখানেও ইঁদুরের হামলা। উৎপাত। টেবিলের মধ্যে লাফিয়ে উঠছে ইঁদুরের দল। চেয়ারের নিচে, ঘরের মেঝেতে তাদের কিচিকিচি রব। কী নিদারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা! কী ভয়ংকর! কী যাতনাদায়ক পরিস্থিতি!

কে একজন বলল :

কল! কল বানাতে হবে। অজস্র, অসংখ্য ইঁদুর ধরার কল।

প্রস্তাব শুনেও কেউ কোনো সাড়া দিল না। কারণ কল বানিয়ে কোটি কোটি ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। বরং কলের কাঠ কেটে ইঁদুরেরা ওদের দাঁতগুলো করে তুলবে আরো ধারালো।

সময় তখন গড়িয়ে চলেছে—

চিন্তার জট আর খুলছে না।

আলোচনার দরজা যেন বন্ধ।

কে কাকে কী বলবে?

মেয়র মাথা নামিয়ে বসেই রয়েছেন।

এক মিনিট। দুই মিনিট। তিন মিনিট। সময় গড়িয়ে চলেছে আপন গতিবেগে। এমন সময়—

ঠিক এমন সময়—

দরজায় শোনা গেল কড়া নাড়ার শব্দ। ঠক ঠক ঠক। মৃদু এবং কোমল সে শব্দ। সচেতন হয়ে উঠল সভাকক্ষে বসে-থাকা লোকগুলো। কে করে শব্দ? কোত্থেকে আসে এই শব্দ? কিসের শব্দ?

ইঁদুরের দল কি টের পেয়ে গেছে—ওদের বিরুদ্ধেই চলছে এখানে ষড়যন্ত্র? ওরা কি দল বেঁধে এল আক্রমণ করতে?

আবারো শব্দ।

কান পাতল সবাই। মনোযোগ দিয়ে। সেই একই ধ্বনি। ঠক ঠক ঠক।

মেয়র উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকালেন। সভার অন্যান্যরাও। ঠিক দরজায়—দরজার কড়া ধরে কে যেন নাড়ছে।

একজন মেয়রের দিকে তাকিয়ে অনুমতি চাইলেন :

দরজা কি খুলে দেব?

চিন্তিত এবং ভীত মেয়র ইশারা করলেন। দরজা খুলতেই সবাই অবাক হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রয়েছে অদ্ভুত এক লোক। অদ্ভুত তার বেশবাস। অদ্ভুত তার চোখের চাউনি।

সে সরাসরি তাকাল মেয়রের দিকে। তারপর ঠাণ্ডা ও শান্ত চোখে সভাকক্ষে উপস্থিত সবার দিকে দেখল।

লোকটা যেমন লম্বা তেমনই রোগা। একমাথা উসুখুসু লম্বা চুল। চুলে তার জট পেকেছে। কোঁকড়ানো সেই চুলে তেল-চিরুনি পড়েনি বহুদিন। গালে তার খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। শরীরের রঙ ধূসর। ময়লার আস্তরণ সব্বো শরীরে।

গায়ে তার লম্বা আলখেল্লা। গলা থেকে নেমেছে পা পর্যন্ত। অর্ধেক লাল, অর্ধেক হলুদ সেই পোশাক। দুই হাতে ফুল-তোলা কাজ। গলায় ঝুরি ঝুরি রঙিন কাপড়ের ঝালর। পরনে তার শতচ্ছিন্ন একটি পাজামা। দেখলেই মনে হবে, জগৎ-সংসারে কেউ নেই তার। না আছে ঘরবাড়ি। না আছে কোনো থাকার জায়গা।

যেন সে একাই এসেছে পৃথিবীতে। মুক্ত পাখির মতো ঘুরে বেড়াবে সে। একেবারে স্বাধীন। বাধাবন্ধন নেই তার। তাই সে দাঁড়িয়ে থাকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে।

চোখেমুখে তার উজ্জ্বল আলো। দ্যুতিময় নীল চোখ। যেমন গভীর তেমনই তীক্ষ্ণ। অদ্ভুত লোকটি দাঁড়িয়ে আছে।

চোখেমুখে সর্বদাই তার মৃদু হাসি। ঠোঁট চিরে বেরিয়ে আসছে কৌতুকের হাসি-খোলা। মাথায় তার লাল-নীল রঙিন একটা টুপি। কোনো চিন্তাভাবনা যেন তার নেই।

সে হাসতে হাসতেই এগিয়ে এল একেবারে মেয়রের কাছাকাছি। মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে নত হয়ে দাঁড়াল। মেয়র জিজ্ঞেস করলেন : কী চাই তোমার? কেন তোমার আগমন?

এইবার লোকটার মুখে খেলে গেল আরো রহস্যময় হাসি।

আপনারা যদি অনুমতি দেন, তবে আমি কিছু বলতে চাই!

আপনার যা বলার জলদি বলুন!

আমি একজন নগণ্য লোক। আপনারা নামিদামি মানুষ। কিন্তু আমার অদ্ভুত রকমের একটি ক্ষমতা আছে। যে-কোনো জীবজন্তুকে আমি বশ করতে পারি। বিশেষ করে যেসব প্রাণী মানুষের ক্ষতি করে তাদের প্রতি বিশেষভাবে প্রয়োগ করি জাদুক্ষমতা। এজন্যই লোকে আমায় বলে, বাঁশিঅলা। জাদুর বাঁশি আমার হাতে।

এই যে দেখুন আমার বাঁশি—

সবাই তখন খেয়াল করে দেখল, সেই অদ্ভুত লোকটির হাতে রয়েছে একটি বাঁশি। সরু এবং সুন্দর। লোকটার গলায় প্যাঁচানো রয়েছে রঙিন কাপড়। কাপড়ের এককোণায় বাঁধা সেই বাঁশি। তার সুরই বেজে উঠবে।

লোকটা বাঁশিটিকে একপাক ঘুরিয়ে দেখাল। অবাক এবং মুগ্ধ বিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে রয়েছে লোকটার দিকে। লোকটা বলল :

দেশ থেকে দেশে আমি ঘুরে বেড়াই। পশুপাখির অত্যাচার থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করি লোকজনদের। কিছুদিন আগে আমি গিয়েছিলাম পুবে। মাছির উৎপাত ছিল সেখানে। সেদিন গেলাম এশিয়া মহাদেশের এক অঞ্চলে। রক্তচোষা বাদুড়ের হাত থেকে উদ্ধার করলাম ওদের। এই বাঁশিতে নানা ধরনের সুর ওঠে। সেই সুর যেন জাদুর সুর। সুর খেলিয়েই আমি জাদু দেখাই।

মেয়র তখন বলতে চাইলেন :

আমাদের এখানে ইঁদুরের অত্যাচার—কী বলব ভাই, দারুণ কষ্টে আছি।

আমাকে এসব বলতে হবে না। আমি সব জানি। আমি ইঁদুরের অত্যাচার থেকে আপনাদের উদ্ধার করতেই এসেছি। কিন্তু আমার একটি শর্ত আছে।

কী শর্ত? সব শর্তই আমরা মানতে রাজি আছি।

না, তেমন কোনো ব্যাপার নয়। এর জন্যে আপনাদের কিছু টাকা খরচ করতে হবে।

কত টাকা? শিগগির বলুন।

দশ হাজার সোনার মুদ্রা!

মাত্র দশ হাজার সোনার মুদ্রা! এ আর এমন ব্যাপার কী। শিগগির—শিগগির আপনি ইঁদুরগুলোকে ঘায়েল করুন। দশ হাজার নয়, আমরা আপনাকে পঞ্চাশ হাজার সোনার মুদ্রা দেব।

বাঁশিআলার মুখে তখনো হাসির আভা লুকিয়ে আছে। মিটিমিটি হেসে আবারো তাকাল সে সবার দিকে।

বাঁশিতে ফুঁ দিল সেই অদ্ভুত লোকটি। কেঁপে কেঁপে একটা মিষ্টি সুরেলা ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল আকাশে-বাতাসে। তরঙ্গে তরঙ্গে কেঁপে উঠল বাঁশির সেই মর্মভেদী সুর।

কেমন মোহন, মায়াবী এক দূরাগত ধ্বনি! অদ্ভুত-পোশাক-পরা সেই লোকটার চোখেমুখে খেলে গেল কেমন এক দীপ্তিময় আলোর আভা। চোখে চোখে যেন ছড়িয়ে পড়ল সেই আলোর দ্যুতি। গাল দুটো ফুলে উঠল তার।

আবার ফুঁ দিল। জোরে, বেশ জোরে। আর অমনি—

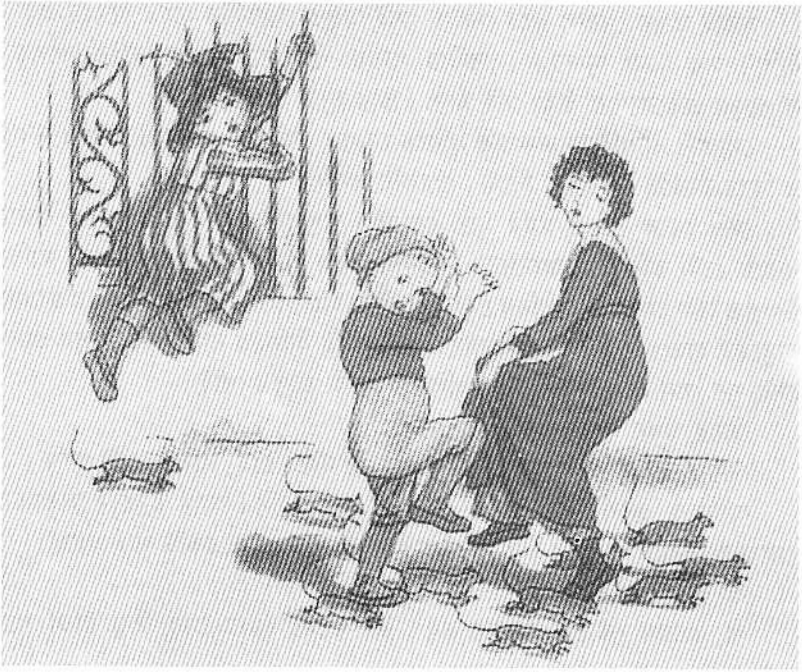

মোহিনী সুরের টানে ঘটতে লাগল অদ্ভুত এক কাণ্ড। হ্যামিলনের সব ইঁদুরের কানে গিয়ে যেন পৌঁছাল সেই ধ্বনি। সেই সুর। জাদুর বাঁশিতে জাদুর সুর।

ইঁদুরদলের কিচিকিচি শব্দ বেড়ে হল দুইগুণ, তিনগুণ, চারগুণ। যে যেখানে ছিল সবাই ছুটে এল দ্রুত, অতি দ্রুত। যেন এক ইঁদুরের মিছিল। সেই মিছিলে শরিক হতেই হবে সবাইকে।

বাঁশির শব্দ তখন বেড়ে চলেছে।

জাদুকরি সেই ধ্বনি বাতাসে বাতাসে ঘুরতে লাগল। হ্যামিলনের প্রতিটা বাড়ির অন্দরে অন্দরে ছড়িয়ে পড়ল সেই বাতাস। আর সেই ধ্বনি ইঁদুরের কানে

পৌঁছাতেই তারা যেন দিশেহারা হয়ে উঠল। কাজকর্ম ফেলে ইঁদুরের দল এল বাঁশিঅলার কাছে। বাঁশির সুরে তারা পাগল। আর কোনো অত্যাচার নয়। আর নয় মানুষকে জ্বালাতন।

এ কেমন মন উতল-করা বাঁশির ধ্বনি!

অস্থির হয়ে উঠল ইঁদুরেরা। এ ওকে টপকে, এর ঘাড়ে ও মাথা রেখে ছুটতে লাগল। যত কাছ থেকে হোক, শুনতেই হবে এই মুগ্ধ-করা বাঁশির সুর।

একে একে এসে জড়ো হতে লাগল ইঁদুরের দল। কত ধরনের ইঁদুর। কত রঙের ইঁদুর।

ইঁদুরের এক বিশাল বাহিনী।

হ্যামিলনবাসীরা দেখল, শহরের প্রতিটা জায়গা থেকেই ইঁদুররা এসে জড়ো হচ্ছে বাঁশিঅলার পাশে। ইঁদুরের ঢল নেমেছে আজ। ছোট বড় মাঝারি লম্বা সরু মোটা সবাই চলেছে গায়ে গা মিলিয়ে। খয়েরি রঙের সবচেয়ে বুড়ো যে-ইঁদুরটি সে-ও চলেছে ল্যাজ পুটুশপাটুশ করে। খেয়েদেয়ে নধরকান্তি যে-ইঁদুরগুলো, তাদেরও আজ ফুর্তির কোনো সীমা নেই। বাঁশির সুরে সুরে নেচে নেচে চলেছে সবাই। দোলনায় বসে যে-ইঁদুরটি ঘুমাচ্ছিল তারও ঘুম ভেঙে গেল চট করে। সে-ও ছুটল তড়িঘড়ি। খাটের তলায় লুকিয়ে থাকা যে-ইঁদুরের দল-মনের সুখে খাচ্ছিল পনির আর মাখন, তারাও ছুটল।

কী অদ্ভুত জাদুকরি মায়াবী সেই বাঁশির সুর! খানায় খন্দে পড়ে, কাদায় পানিতে লুটোপুটি করে ছুটল সব। কারখানার চিমনির উপর ছিল যে-ইঁদুরটি, তিরতির করে এগিয়ে এল সে। ঝোপঝাড় পেরিয়ে ছুটতে গিয়ে অনেকে হল ক্ষতবিক্ষত। লোভ এবং হিংসা ভুলে চলল তারা সারি বেঁধে পাশাপাশি।

বাঁশির সুরেলা ধ্বনির নিচে চাপা পড়ল ইঁদুরের কিচিকিচি শব্দ। তারা শুধু ছুটছে। যে যেখানে ছিল সেখান থেকেই ছুটতে ছুটতে এসে একত্রিত হল বাঁশিঅলার সামনে। বাঁশির সুর তখন মোহ তৈরি করেছে। অদ্ভুত আনন্দময় পরিবেশ। যেন আজ এক মহা-উৎসব।

আনন্দ আনন্দ আর আনন্দ চারিদিকে। খুশির কলতান। হাসির হররা। ফুর্তির কলরব। ইঁদুরেরা বুঝতে পারছে—এই বাঁশির ধ্বনি তাদের মধ্যে কী পরিমাণ খুশির বন্যা বইয়ে দিয়েছে। ইঁদুরের লাফালাফি দেখেই বোঝা গেল, আনন্দের চোটে ওরা আজ মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে পারে।

বাঁশি বাজাতে বাজাতে সেই বাঁশিঅলা তখন এগিয়ে চলল সামনে। সুরের ধ্বনি বেড়ে চলেছে ক্রমেই। দূর বহুদূরে যেন সেই ধ্বনি ছুটেছে। হেলে দুলে, নেচে নেচে বাঁশিঅলা চলল।

তার পেছনে ইঁদুরের দল।

সারি বেঁধে ধীরেসুস্থে চলেছে সবাই।

মন-পাগল-করা সুরের তালে তালে চলেছে ইঁদুরবাহিনী। বাঁশিঅলা যে-পথ দিয়ে যায় পেছনে চলে ইঁদুরেরা।

খাল পেরিয়ে, নালা পেরিয়ে চলছে বাঁশিঅলা। হাট পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে চলল। পথ থেকে চলল। উঁচুনিচু পথ। সরু চওড়া পথ। কাঁচামাটির পথ।

পথ যেন আর ফুরায় না।

যেতে যেতে, যেতে যেতে—

বাঁশিঅলা এসে দাঁড়াল ওয়েসার নদীর তীরে। কী নিস্তরঙ্গ, শান্ত, সুন্দর সেই নদী! দুঃখী মায়ের চোখের মতো টলটলে এক নদী। এই নদী সারাক্ষণ চুমু খায় হ্যামিলন শহরকে।

নদীর তীরে এসে দাঁড়াল বাঁশিঅলা।

সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে নদীর জল। নদীর জলে পড়েছে নীল আকাশের ছায়া। বাঁশিঅলা পেছন ফিরে দেখল, তাকে ঘিরে রেখেছে ইঁদুরের দল। পেছনে দীর্ঘ মিছিল। ইঁদুরের মিছিল। শুধু ইঁদুর আর ইঁদুর।

বাঁশিঅলার জাদুর বাঁশি তখন আরো জোরে বাজতে লাগল। আরো সুরেলা ধ্বনি সেই বাঁশিতে। আরো মধুমাখা। আরো তীব্র।

বাঁশিঅলা তখন নদীর তীর ধরে আস্তে আস্তে নামতে লাগল জলে। এক কদম, দুই কদম এইভাবে এগুতে এগুতে সে গেল হাঁটুপানিতে। ইঁদুরের দল হুড়মুড়িয়ে পড়ল পানির স্রোতে। বাঁশিঅলা যত এগোয় ইঁদুরের দলও তত পানিতে পড়ে। পানির স্রোতে ভেসে যায় তারা।

ভেসে যায়। কোথায় যায় কেউ জানে না!

বাঁশির সুর বাজছে। মায়াময় সেই সুরের টানে ইঁদুররা ঝাঁপিয়ে পড়ছে নদীর পানিতে। ঝাঁপিয়ে পড়েই টের পাচ্ছে স্রোতের টান। নিমেষে মরার মতো ভাসতে ভাসতে চলল তারা। পানিতে বারকয়েক হাবুডুবু খেয়েই তলিয়ে গেল ইঁদুরগুলো। গভীর জলের টানে হারিয়ে গেল হ্যামিলনের ইঁদুরেরা। অত্যাচারী ইঁদুরের দল।

শেষ ইঁদুরটাও যখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে জলে নামল, তখনই, ঠিক তখুনি বাঁশির সুর বন্ধ হল। সব ইঁদুরই কি মারা গিয়েছিল সেদিন?

না, মাত্র একটি ইঁদুর—

একটি ইঁদুরই বেঁচে গিয়েছিল। বেশ নাদুশনুদুশ, হৃষ্টপুষ্ট তাগড়া সেই ইঁদুরটা নদীর জলে নেমেছিল ঠিকই—কিন্তু সে বেঁচে গেল।

গায়ে ছিল তার প্রচণ্ড শক্তি।

আর বয়সও ছিল তার অল্প।

একবার সে ডুবে গিয়েছিল গভীরে।

তারপর অনেক কষ্টে সাঁতরাতে শুরু করে। সাঁতার, সাঁতার আর সাঁতার। ডুবসাঁতার আর চিৎসাঁতারে সে ঐ পাড়ে গিয়ে ওঠে।

ইঁদুরবাহিনীর মধ্যে একমাত্র সেই-ই বেঁচে রইল। বেঁচে-থাকা ইঁদুরটি বলে বেড়াত নানা গল্প। বাঁশির সুর শুনে কী মনে হয়েছিল তার! কেমন রিনরিনে একটা ব্যথা জেগেছিল তার বুকে! কেমন ছিল সেই অনুভূতি!

নানাভাবে সবাইকে সে এই গল্প বলে বেড়াত। বাঁশির সুর কানে গিয়েছিল আচমকা। মধুর সেই ধ্বনি। যেন স্বর্গ থেকে ঝরে পড়ছে সুরের সেই রস-সুধা! মনে হচ্ছে কে যেন পাগল করে দিচ্ছে। যেন এক দারুণরকম মায়ার খেলা।

বাঁশির সুরে মনে হল, কে যেন অনেক খাবার নিয়ে এল। অনেক খাবার! অনেক ফলমূল! পাকা টসটসে আঙুর। লাল রঙের বড় বড় আপেল। পাকা পাকা নাশপাতি।

যেন এক উৎসব হবে।

বিচিত্র ভোজের উৎসব।

বেঁচে-থাকা ইঁদুরটি বলে যায়—

বাঁশির সুর শুনে মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। মনে হল খাবারগুলো চোখের সামনে। ইঞ্চিখানেক দূরে। যেন লাফ দিলেই দাঁত বসানো যাবে। যেন কুটকুট করে ভেঙে ফেলা যাবে বাদামের খোসা।

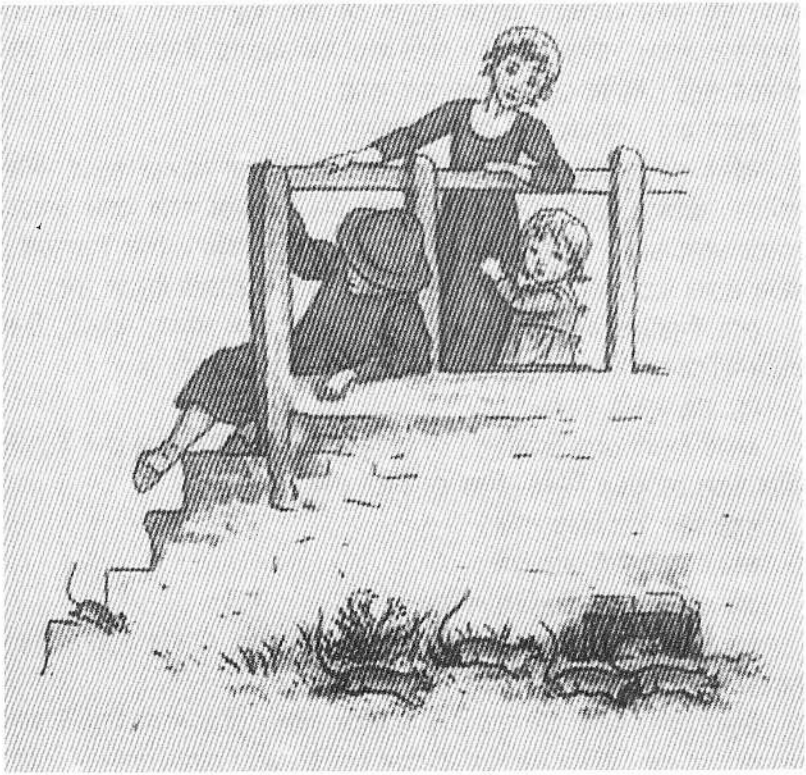

বাঁশির সুর যেন ডাক দিচ্ছে : এসো, এসো তোমরা সবাই। এসো রঙের খেলায় মেতে ওঠো সব। এসো, আনন্দ-উৎসবে যোগ দাও। করো, সবাই মিলে আনন্দ করো। আনন্দ, আনন্দ আজ সবখানে।

চলো, সেই মহা আনন্দ-মিছিলে গিয়ে শরিক হই আমরা। আনন্দের বন্যা বয়ে যাবে আজ। আনন্দে ধন্য হয়ে উঠছে সব। আনন্দ ছাড়া আজ আর কিছুই নেই।

এমনই উন্মাতাল ছিল সেই বাঁশির আহ্বান! এমনই আকর্ষণীয়, এমনই মোহময় সেই সুর! পাগলের মতো আমরা মিছিলে শরিক হয়েছিলাম। এগিয়ে চলেছিল সেই উৎসব। কিছুই খেয়াল ছিল না আমাদের। যেন এক ঘোরের ভিতরে, নেশার মতো ছুটে চলেছিলাম।

কোথায় গিয়েছিলাম জানি না। পানির স্রোতের মধ্যে গিয়ে টের পেয়েছিলাম, আমি এগিয়ে চলেছি মৃত্যুর দিকে। মৃত্যু ছাড়া আমার আর কোনো পথ নেই।

এখন যদি বাঁচতে হয় তবে তীব্র লড়াই করে বাঁচতে হবে। ভাগ্য আমার ছিল সুপ্রসন্ন। যে করেই হোক নদীর ঐপাড়ে আমি উঠবই। হ্যামিলনে বসে বসে মাখন-পনির খেয়ে আমার শরীরটা হয়েছিল বেশ তাগড়া। শক্তিও ছিল গায়ে। সাঁতার শুরু করলাম।

সে এক জীবনপণ সংগ্রাম!

একমাত্র আমিই বেঁচে গেছি। হায়রে! কী তীব্র! কী মায়াবী! কী অসহ্য সুন্দর! কী ভয়ংকর ভালো-লাগা সেই বাঁশির সুর!

এই কথা কাউকে বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

ইঁদুরটি সবাইকে গল্প বলে বেড়াত।

করুণ এবং গভীর অভিজ্ঞতার সেই গল্প!

হ্যামিলন শহরে নেমে এল শান্তি।

গভীর প্রশান্তি দেখা দিল মানুষের মনে। ইঁদুরহীন এক শহর। নেই কোনো উৎপাত। নেই জ্বালা-যন্ত্রণা। নেই বিড়ম্বনা কিংবা কোনো উপদ্রব। শহরটি কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। যেন এইমাত্র কেউ এসে সাফ করে দিয়েছে।

হ্যামিলনবাসীদের মনে ফিরে এল আনন্দ। সবাই যে-যার ঘরদোর পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন করার কাজে ব্যস্ত হয়ে রইল। এই শহরে ইঁদুর যেন আর প্রবেশ করতে না পারে এ-রকম ব্যবস্থাই নিতে হবে এখন।

লোকেরা আবার মন ভরে খেতে পারবে। রাতে আরাম করে ঘুমুতে পারবে। ইঁদুরের কিচিকিচি ডাক এখন আর নেই। কুটকুট করে কামড় বসিয়ে জিনিশপাতি নষ্ট করে ফেলেছিল ইঁদুরেরা।

হায়রে ইঁদুর! তোমরাই জীবনটাকে করে তুলেছিলে দুর্বিষহ। তোমরা স্বপ্নের মতো সুন্দর শহরটাকে করে তুলেছিলে মৃত নগরী। তোমরা ছিলে অত্যাচারী।

কিন্তু আজ তোমরা কোথায়?

ঐ তো দূরে ওয়েসার নদী। নদীর স্রোতোধারায় কোথায় ভেসে গেছ আজ তোমরা! কোথায় গিয়েছ? শহরটাকে বানিয়ে তুলেছিলে আবর্জনার স্তূপ।

শহরের প্রতিটি মানুষকে করেছ জ্বালাতন। মানুষের বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছিলে শহরটাকে।

আজ বড় সুখের দিন।

আজ বড় আনন্দের দিন।

আজ উৎসব হবে হ্যামিলনে। আনন্দ-উৎসব। আজ আলোর ফোয়ারা জ্বলবে। আজ খাবারের ঢল বইবে। আজ আকাশে আকাশে ছড়িয়ে পড়বে রঙের ফুলঝুরি। আজ বাবা মা ভাই বোন সবাই নাচবে একসঙ্গে। হ্যামিলনের সবচেয়ে দুঃখী যে তার মুখেও আজ হাসি। যার ঘরে কিছুই নেই সে-ও আজ আনন্দিত।

হ্যামিলন শহর যেন আজ আনন্দ-নগরী। আবার পাখিরা গান গেয়ে উঠল এ শহরে। আবার গাছে গাছে এল কচি কিশলয়। আবার ফুলেরা হেসে উঠল। প্রজাপতি উড়ে গেল ফুরফুর করে।

আনন্দ যেন আজ ধরে রাখা যায় না।

হ্যামিলন শহরের যিনি মেয়র, যিনি নগরের প্রধান, তারও যেন কাজের শেষ নেই। তিনি হুকুম দিচ্ছেন রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার জন্যে। যা-কিছু খানাখন্দ আছে, যা-কিছু ফাঁক ফোকর আছে, সব বন্ধ করে দিতে হবে। যেন আর একটি ইঁদুরও হ্যামিলনে প্রবেশ করতে না পারে।

আর অমনি—

অমনি এল সেই বাঁশিঅলা। এল মেয়রের কাছে। মুখে তার সেই হাসি। লাজুক এবং রহস্যময়। মুখে একটুকরো অনাবিল হাসির খেলা।

তার কথা বুঝি ভুলে গেছে সবাই। এই আনন্দ-উৎসবে অদ্ভুত বাঁশিঅলার কথা আজ কে মনে রাখে! কাজ যে করে সে কি কাজের মূল্যায়ন পায় সব সময়! অদ্ভুত পোশাক পরনে সেই বাঁশিঅলা মেয়রকে বলল :

আমার পাওনা মিটিয়ে দিন। আমার অনেক কাজ। আমি চলে যাব।

মেয়র তখন আনন্দ-উৎসব নিয়ে ব্যস্ত।

তাকাল সে বাঁশিঅলার দিকে—

কী দিতে হবে তোমায়?

বাঁশিঅলা মৃদু হেসে বলল :

কী দেবেন মানে? এ-কথা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মাত্র দশ হাজার সোনার মোহর—কথা তো এই-ই ছিল!

কত? কত বললেন ? দশ হাজার!

মেয়রের যেন ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা।

বলেন কী আপনি? এত টাকা দেয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু, আপনারাই কিন্তু রাজি হয়েছিলেন। বরং আপনারা বলেছিলেন দশ নয় আপনাকে পঞ্চাশ হাজার মোহর দেব আমরা।

বলেছিলাম বটে! কিন্তু তখন কি আমাদের কারো মাথার ঠিক ছিল। তখন আমরা ছিলাম দিশেহারা। কী বলতে কী বলেছি!

বাঁশিঅলা এবার তীক্ষ্ণচোখে তাকাল মেয়রের দিকে।

আমার পাওনা মিটিয়ে দিলেই আমি চলে যাব। আমি কম-কথার মানুষ। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা আমি পছন্দ করি না।

কিন্তু তোমাকে দশ হাজার মোহর দেয়া সম্ভব নয়। আজ এখানে দারুণ উৎসব হবে। প্রচুর খরচাপাতি আমাদের। তুমিও না-হয় আমাদের আনন্দে অংশগ্রহণ করো।

আমার পাওনা মিটিয়ে দিন।

গম্ভীরভাবে বলল বাঁশিঅলা।

কিসের পাওনা?

যেন একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল মেয়রের কথা থেকে—

তুমি তো শুধু বাঁশি বাজালে। ইঁদুরগুলো তো গিয়ে পড়ল ঐ আমাদের নদীতেই। সত্যি কথা কী—ইঁদুরগুলো তো আর ফিরে আসবে না আমাদের

শহরে। কিন্তু আমরা অকৃতজ্ঞ নই। আমরা তোমার কথা মনে রেখেছি। দশ হাজার না হলেও কিছু সোনার মোহর তোমায় দেব।

কিছু নয়, আমায় পুরোপুরিই দিতে হবে।

কী করে দেব বলো তোমায়? কী আছে আমাদের? ইঁদুরেরা সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। অর্থ বলো, সম্পদ বলো কিছুই যে আর নেই। এখন তো আমরা নিঃস্ব। তবু তোমার উপকারের কথা আমরা মনে রাখব চিরকাল।

কিন্তু আমার পাওনাটা—

তুমি দেখছি নাছোড়বান্দা লোক। বুঝিয়ে বলছি—তা-ও বুঝছ না?

আমি কিছু বুঝতে চাইছি না।

পঞ্চাশ বা একশোটা সোনার মোহর দিই তোমায়। এই দিয়েই কিছু খেয়ে নিও তুমি।

বাঁশিঅলা এবার আকাশ থেকে পড়ল। ভীষণ অবাক সে! বলে কী মেয়র লোকটা!

বাঁশিঅলার রাগ হল খুব।

আমাকে ঠকানোর কোনো চেষ্টা করবেন না। এতে আপনাদের অমঙ্গল হবারই সম্ভাবনা বেশি। আমি তো আগেই বলেছি—আমি জাদুকর বাঁশিঅলা। আমি দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াই। পশুপাখিদের অত্যাচার থেকে মানুষজনকে উদ্ধার করি আমি।

এই যেমন—

এখন আমার হাতে একদম সময় নেই। আমাকে যেতে হবে বাগদাদে। খলিফার বাবুর্চিখানায় কী এক দারুণ ভয়ংকর রকম কাঁকড়াবিছের আবির্ভাব ঘটেছে। বাবুর্চি খবর পাঠিয়েছে। উদ্ধার করতে হবে তাকে। আমারই সম্মানে ভোজন হবে সেখানে। বাবুর্চি রান্না করবেন বিশেষভাবে। ওদের সঙ্গে অবশ্য এখনো দরদাম ঠিক হয়নি। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

আমরা কি তোমার সঙ্গে বেঈমানি করছি? আমরা অবশ্যই তোমার উপকারের কথা স্মরণ করছি। তোমার গুণের কথা মনে রাখছি—

না, মনে রাখছেন না।

আপনারা জানেন না, আমার বাঁশিতে অন্যরকম সুরও বাজে। ভয়ংকর সুন্দর সুর।

মেয়র এবার রেগে গেলেন—

কী এমন সুর বাজে তোমার বাঁশিতে? যাও সেই সুর বাজাও তুমি। কিছু যায়

আসে না তাতে। একশো মোহর নিলে নাও—নইলে বিদায় হও। আমরা এখন আনন্দ-উৎসব করব। বিশাল উৎসব।

বাঁশিঅলা কিছুই বলল না। কথা বাড়াল না আর সে। মলিন এবং বিষণ্ন মুখে নেমে এল রাস্তায়। মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা তার পছন্দ নয়।

আবার সে বাঁশিতে সুর তুলল।

প্রাণকাড়া মনকাড়া সুর। সুরের আগুন ছড়িয়ে পড়ল প্রাণে প্রাণে। সুরের আলো ছেয়ে ফেলল হ্যামিলন শহর। সুরের হাওয়া চলল গগন বেয়ে। ফুলের ভেতর মধুর মতো সেই সুর ছড়াল।

হ্যামিলনের শিশুরা চঞ্চল হয়ে উঠল। ছুটোছুটি শুরু করল তারা। বাঁশির সুর আসে কোথেকে! কে ডাকে অমন করে!

কে, কে ডাকে আমাকে!

মরা গাছের ডালে ডালে সুরের আগুন নাচে আজ তালে তালে। বয়ে যায় পাগল হাওয়া। ছেলেমেয়েরা ছুটে আসে বাঁশিঅলার কাছে। শুরু হয়েছে তাদের কলরোল। তাদের উচ্ছ্বাস। তাদের হৈ চৈ হুল্লোড়।

খেলা ভুলে ছুটল একটি শিশু। মায়ের কোল থেকে নেমে দৌড় শুরু করল একজন।

একটি শিশুর হাত থেকে উড়ে গেল রঙিন একটি ঘুড়ি।

যে-ছেলেটি সন্ধ্যেবেলা জোনাক-পোকা কুড়াত সে-ও ছুটল।

যে-ছেলেটি গান গাইতে সকালে ওঠে, সে-ও সুরের ঝরনাধারায় আন্দোলিত।

মায়ের শেষ চুম্বনের দাগ মুছে নিয়ে ছুটে এল একটি শিশু।

ক্লাসের দুষ্টু ছেলেটি—যেন তারও আনন্দের কোনো শেষ নেই।

সবচেয়ে দুঃখী যে-ছেলেটি—হ্যামিলনের পথে পথে দেয়াশলাই বিক্রি করত—সে-ও ছুটল। তারও আনন্দ যেন আর ধরে না।

মা নেই, বাবা নেই—একা একা যে-ছেলেটা বেড়ে উঠেছিল ফুটপাতে সে-ও ছুটছে।

মন যে আজ কেমন করছে কেউ জানে না। কেউ বোঝে না মনের খেলা।

বাঁশিতে সুর উঠছে আরো তীব্রভাবে। আরো তীক্ষ্ণ। আরো হৃদয়ভেদী।

সুরে সুরে জাগল শিশুদের হাসি। বাঁশি বাজছে। সবাই সুরে সুর মেলাচ্ছে। যেন সুরের ঝরনাতলার নির্জনে এসেছে সবাই। সবাই আনমনা। সবাই যেতে চাচ্ছে যেন বাহির দেশে।

বাঁশির সুরে যেন ফুল ফুটছে বাগানে। আকাশে জমেছে রঙের মেলা। কুঞ্জবনের শাখায় যে-ফুল—এ ফুল সে-ফুল নয়। বাতায়নের লতায় যে-ফুল দোলে—এ ফুল সে-ফুল নয়। দিশেহারা আকাশ ভরা সুরের ফুল ফুটেছে আজ। আকাশের আনন্দবাণী নেমে এসেছে ভূমিতে। হৃদয়মাঝে বেড়ায় ঘুরে বাঁশির সুর। বাঁশির সুরগুলো যেন চরণ পেয়েছে আজ।

আকুল-করা সেই সুরের আহ্বান।

পাগল-করা সেই সুরের ডাক।

মেঘের ছায়া আজ লুটিয়ে পড়েছে বনে। ভোরের পাখি উড়ে চলেছে আকাশ জুড়ে। ফুটল আলোর অমল কমল। নীল আকাশের ঘুম ছুটেছে। হাওয়ার নাচন লেগেছে ডালে ডালে।

হ্যামিলনের বাঁশিঅলার ডাকে মনে হচ্ছে, দূরের হাওয়ায় ডাক দিল এই সুরের পাগলাকে।

চলল, চলল, চলল।

দল বেঁধে চলল শিশুরা।

আহা, কী আনন্দ আজ আকাশে-বাতাসে। কত শোভা চারিপাশে। আজ আমাদের বড়ই সুখের দিন।

লাটিম ফেলে, নাটাই ফেলে ছুটল শিশুরা। ভাই ছুটল বোনের গলা ধরে। ছুটতে ছুটতে জুতো খুলে গেল কারো পায়ের। কারো খুলে গেল জামার বোতাম। কেউ পড়ল আছড়িয়ে। কেউ পড়ল পা পিছলে। তবু চলার কোনো বিরাম নেই।

কী যে এক ঘোরের মধ্যে ছুটল সবাই!

সেই অদ্ভুত বাঁশিঅলা—লম্বা, রোগা লোকটি ফুঁ দিচ্ছে। সুর উঠছে বাঁশিতে। বাতাসে মিশে যাচ্ছে সুরের জাদু। সেই জাদুতে উত্তেজিত হয়ে উঠছে শিশুরা।

ঘুম থেকে উঠেই ছুটল একটি শিশু। চোখে তার এখনো ঘুমের ভাব।

বিছানায় শুয়ে ছিল অসুস্থ এক ছেলে—বাঁশির সুরে তারও আকুলিবিকুলি করে উঠল মন। ছুটতে হবে, এখনই ছুটতে হবে তাকেও। অসুস্থ সে—তাতে কী আসে যায়!

ইশকুলের পড়া তৈরি করছিল, এই যে ছেলেটা, চলল সে।

সবেমাত্র খেতে বসেছে ছেলেটা। মা পাশে বসা। মুখে পুরে দিচ্ছে খাবার। তারও মন চঞ্চল হয়ে উঠল। চলল সে বাঁশিঅলার কাছে।

হ্যামিলনবাসীরা অবাক হয়ে দেখল, কী আশ্চর্য ব্যাপার! শিশুর দল চলেছে বাঁশিঅলার পেছনে পেছনে। কোথায় যাচ্ছে? ইঁদুরের মতোই কি এই শিশুদের পরিণতি হবে? আতঙ্কে, ভয়ে নির্জীব হয়ে গেল নগরবাসীরা।

বাঁশিঅলা এবারও কি যাচ্ছে ওয়েসার নদীর কূলে? এবার কি শিশুর দলই ডুবে মরবে পানিতে?

এ হতে পারে না। থামাও থামাও এ বাঁশিঅলাকে। পঞ্চাশ নয়, ওকে লক্ষ সোনার মোহর দাও। ওকে ফিরিয়ে আনো। খ্যাপার মতো, উন্মাদের মতো কোথায় চলেছে বাঁশিঅলা!

কারো কিছুই করার নেই।

হাত গুটিয়ে সবাই বসে আছে।

তাকিয়ে আছে দূরে। যেন নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকা। শিশুর দলকে বোঝানো যাবে না। বলা যাবে না ওদের সঙ্গে কথা। ফেরানো যাবে না ওদেরকে।

ঘরের ছেলে কি ঘরে ফিরবে না?

কিসের টানে, কিসের ছলনায়, কিসের মায়ায় চলেছে ওরা? কী এমন জাদুমাখা এই বাঁশি! কী এমন পাগলা সুর! কোন আনন্দের উৎস লুকিয়ে রয়েছে এই বাঁশিতে!

নদীর দিকেই দেখি এগিয়ে চলেছে বাঁশিঅলা! ঐ তো ওয়েসার! ঢেউগুলো কেমন ঝিকমিক করছে! বাঁশিঅলা কি নদীর জলেই নেমে যাবে! নদীর জলেই কি ডুবে যাবে এই সুন্দর, সুখী, স্বপ্নময় শিশুর দল!

ওদের স্বপ্ন, ওদের শৈশব, ওদের কল্পনার রঙিন ফানুস—সবই কি মিলিয়ে যাবে!

বুকের গভীর থেকে কান্না আর হাহাকার ধ্বনির সুর ভেসে এল হ্যামিলনবাসীর। সবাই স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। করুণ এবং ভয়াবহ নিয়তি ছাড়া এখন আর কীই-বা করার আছে! অবধারিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু নাহ্।

বাঁশিঅলা নদীর তীর ধরেই এগিয়ে চলল। সঙ্গে তার বিশাল শিশু-কিশোর বাহিনী। যেন এক আনন্দের স্রোত। সুরের ধ্বনির সঙ্গে আনন্দের লহর।

বাঁশিঅলা চলল পুবে।

সোজা পুবে। পাহাড়ের দিকে।

যে পাহাড়টা ছায়া দিয়ে রেখেছে হ্যামিলন শহরকে। মাথা তুলে মিলেছে আকাশের সাথে। বিশাল মৌন এক পাহাড়।

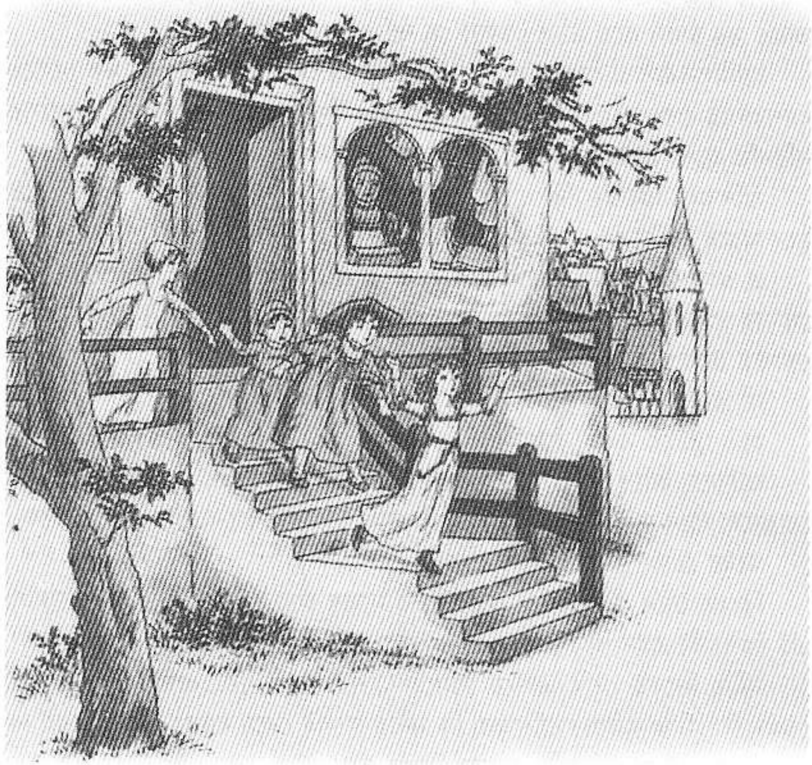

নদীর তীর ছেড়ে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে কেন বাঁশিঅলা? পাহাড়ের উপরে উঠবে কীভাবে? এইবার ওকে আটকাতে হবেই। আপনিই ওর চলার পথের গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে।

হ্যামিলন শহরে একটিও শিশু নেই। সব শিশুই চলে গেছে বাঁশিঅলার কাছে। সবার মনেই ফুর্তির ঢেউ। সবার মুখেই উল্লাস। সবাই পায়ের সঙ্গে পা

মিলিয়ে চলেছে। যেন ঘুঙুর বাজছে। পায়ের ছাপ পড়ছে যেখানে, সেখানেই যেন ফুটে উঠছে ফুল। পাথর ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে ঝরনার জল। শিশুদের হাসিতে হাসিতে যেন অবিরাম ঝলমল করে ঝরে পড়ছে হিরে-মণি-মুক্তো।

পাহাড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বাঁশিঅলা। বাজল আরো জোরে বাঁশি। আরো লোভনীয়। আরো সুতীব্র।

সেই সুরে মৌন পাহাড়ের মনও গলে যায় মোমের মতো। নরম এবং তরল। দুই ভাগ হয়ে সরে যায় পাহাড়ের বুক। তৈরি হয় রাস্তা। ফুল-বিছানো পথ। দূর, কতদূরে গেছে রাস্তা—চমৎকার সেই ফুলেল রাস্তা দিয়ে চলল বাঁশিঅলা। পেছনে ছেলের দল।

ওরা কি চলেই যাচ্ছে? আর কি ফিরবে না কেউ! ওরা কি একবারের জন্যেও পেছন ফিরে দেখবে না স্বপ্নের মতো সুন্দর ওদের প্রিয় হ্যামিলন শহরকে। ওরা কি চলে যাবে পাহাড়ের ভেতরে!

ঠিক ঠিক হলও তাই। সবাই চলে গেল সেই রাস্তা ধরে। নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে সবাই চলে গেল। তারপর আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল পাহাড়ের মুখ।

আশ্চর্যের ব্যাপার! এইমাত্র এখানে ছিল একটি সুন্দর রাস্তা। হৈ চৈ হচ্ছিল। হাসি-আনন্দ হচ্ছিল। একমুহূর্তে যেন সব উধাও হয়ে গেল। সব মিথ্যে হয়ে গেল। এখনই যা ছিল সত্যি—সব মিথ্যে! সব মিথ্যে!

কোথায় গেল?

কোথায় গেল হ্যামিলনের বাঁশিঅলা?

হে সুন্দর শিশুরা! হে অনাগত কালের দেবদূতরা! হে আমাদের স্বপ্নেরা! হে হ্যামিলনের আনন্দ! কোথায় গেলে তোমরা?

সবাই কি চলে গেল ঐ পাহাড়ের ভেতরে? সবাই কি হারিয়ে গেল? মুছে গেল ফুটফুটে সোনালি শিশুদের ছবি?

মাত্র একজন—

একটি ছেলে। যে হ্যামিলনের চোখের মণি, প্রাণের টুকরো, রয়ে গেল। সে যেতে পারেনি। কারণ সে ছিল খোঁড়া। হাঁটত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ধীরে ধীরে। পারত না দ্রুত ছুটতে।

তাই সে—

পেছনে পড়ে গিয়েছিল সবার।

সে যখন পৌঁছায় তখন বন্ধ হয়ে গেছে পাহাড়ের দরজা।

বন্ধ হয়ে যায় বাঁশির সুর।

নেই আর পাখির গান। বন্ধ নদীর কলতান। তন্ময় এবং ঘোরের ভাব তার কেটে যায়। হঠাৎ যেন ছিন্ন হয়ে আসে মনের ঘোর। সেই পাগলপারা মনটা যেন চুপসে আসে।

তারপর থেকেই খুব মন খারাপ হয়ে যায় ছেলেটার। সব চলে গেছে। বন্ধুরা সেই আনন্দ-উৎসবে গিয়েছে। আর আমি! হায় হায় আমার কী হল! কেন আমি একটু দেরি করলাম! আমাকে রেখে কেন ওরা চলে গেল!

ছেলেটা বলত। অদ্ভুত, আশ্চর্য এক অনুভূতির কথা বলত। যাচ্ছিল তারা স্বপ্নের দেশে। আশ্চর্য সুন্দর এক দেশ। ফুলে-ফলে ভরা। গাছে গাছে পাখি ডাকে। ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় প্রজাপতি, মৌমাছি। মৌমাছি এখানে কামড় দেয় না। প্রজাপতি এখানে কানে কানে কথা বলে। এখানে ফুলের পোশাক পরে সবাই।

ঝরনায় পানি পান করে। হরিণ আর খরগোশের সঙ্গে করে খেলাধুলা। রাতে আকাশজুড়ে ওঠে চাঁদ। গোল চাঁদ। জোছনার আলোয় ভেসে যায় দিগন্ত। সেখানেই আসর বসবে জগতের শিশুদের। তারা গান গাইবে। তারা নাচবে। তারা হাতে হাত ধরে খেলা করবে।

আনন্দ ছাড়া সেখানে আর কিছুই থাকবে না। দুঃখী শিশুটিও সেখানে হাসবে। থাকবে না কারো অভিযোগ। এ-রকমই একটা আনন্দনগর সেটা।

আহা, কী আনন্দময় জায়গা থেকেই-না বঞ্চিত হলাম আমি। হতভাগ্য আমি! দুঃখে-কষ্টে হৃদয় ফেটে যায় আমার। কেন আমি খোঁড়া হলাম!

কেন? কেন?

আর একটু এগুলেই আমি চলে যেতে পারতাম পাহাড়ের ঐ পাড়ে। তারপর কত আনন্দই-না হত!

ছেলেটা সারাক্ষণ এইসব বলত।

আর কাঁদত। ঝরঝর করে তার চোখের জল ঝরত। কাঁদত অবিরল ধারায়। হ্যামিলনের লোকেরা টের পেল, কিছুক্ষণ পরেই টের পেল—কী ভয়ানক ক্ষতি হয়ে গেছে তাদের।

খবর আনো। লোক পাঠাও। খোঁজ আনো। ঘোড়ায় চড়ে ছুটল লোকজন। আকাশ কাঁপিয়ে, বাতাস কাঁপিয়ে ছুটল।

খবর আনতে হবে।

কিন্তু কোথায় খবর? পাহাড়ের গায়ে গায়ে মিলিয়ে গেল ঘোড়ার খুরের ধ্বনি।

কোনো খবর নেই।

শুরু হল কান্না।

হ্যামিলনবাসীদের কান্না।

শিশুদের খবর নেই। সেই যে গিয়েছে তারা বাঁশিঅলার সঙ্গে, আর কি ফিরবে তারা?

জানি না।

জানে না কেউ।

আকাশ কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল। শিশুদের শোকে মাথা নামিয়ে রইল গাছেরা। ফুল তাকাল না পাপড়ি মেলে। ওয়েসার নদীর জল রইল স্থির।

সব ছাপিয়ে শুধু শোনা গেল মায়েদের কান্না। বুকফাটা আর্তনাদ, মুক্তোবিন্দুর মতো কান্নার জল চিকচিক করতে লাগল হ্যামিলনে। মায়েদের কান্নার কি কোনো তুলনা হয়? হয় না।

বাঁশিঅলার সঙ্গে চলে যাওয়া হ্যামিলনের সেই শিশুরা ফেরেনি আর কোনোদিন। তবে তারা কি গিয়েছে সুন্দর সেই আনন্দনগরীতে?

কে জানে!

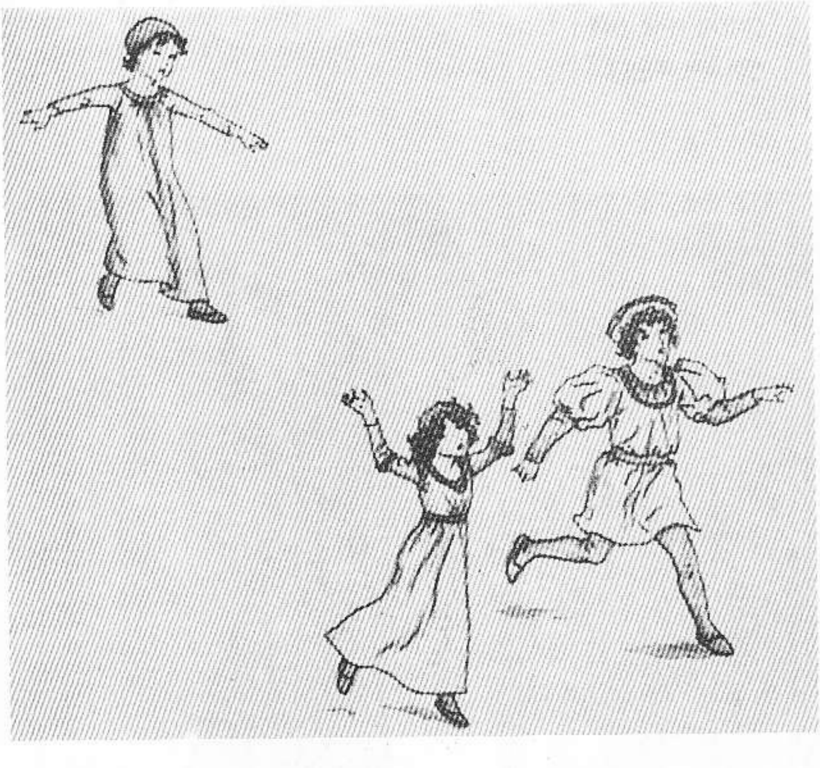

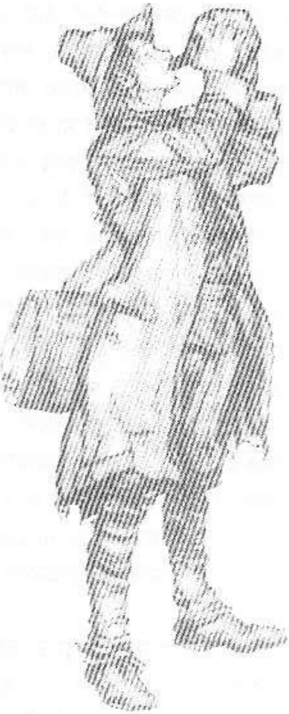

রিপ ভ্যান উইঙ্কল

[এখানে যে গল্পটি বলা হচ্ছে সেটা ডিয়েড্রিচ নিকারবকার নামে ন্যুইয়র্কবাসী এক মৃত বুড়ো ভদ্রলোকের পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে। তিনি ন্যুইয়র্কের পুরনো দিনের ইতিহাসের খোঁজ-খবর রাখতেন। ন্যুইয়র্ক রাজ্যের সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দা ছিল হল্যান্ড থেকে আসা কিছু মানুষ। তাদের কেউ বলে ডাচ, কেউ বলে ওলন্দাজ। একেবারে প্রথমদিকে ওলন্দাজদের মধ্যে যারা এসেছিল ঐ বুড়ো ভদ্রলোক তাদের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য খুঁজে বের করেছিলেন। আজকাল অবশ্য ন্যুইয়র্ক নিয়ে লেখা যে কোনো বইপত্রেই সে-সব তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি যখন এ নিয়ে গবেষণা করছিলেন তখন লোকে তেমন কিছুই জানত না। তিনি প্রবীণ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে চলে যেতেন তথ্য সংগ্রহের জন্য। বিশেষ করে যেতেন তাদের স্ত্রীদের কাছে। কারণ তাঁদের কাছ থেকেই পাওয়া যেত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এভাবেই ধীরে ধীরে খুঁজে বের করেছিলেন অনেক কিংবদন্তি, অনেক অমূল্য খবর। সত্যিকারের

ইতিহাস। কেউ কেউ বলে ওলন্দাজদের সম্পর্কে তাঁর এত আগ্রহের কারণ তিনি নিজে ছিলেন এক খাঁটি ওলন্দাজ পরিবারের সন্তান। নিচু ছাদঅলা এক ওলন্দাজ পরিবারের খামারবাড়িতে অন্যদের সঙ্গে গাদাগাদি করে বসবাস করছিলেন তিনি। এরই মধ্যে আগাছার মতো ছড়িয়ে থাকা বইয়ের কালো অক্ষরগুলোকে পোকার মতো আপন করে আঁকড়ে ধরেছিলেন। দিনরাত কাটত তাঁর ঐ কালো অক্ষরগুলোকে নিয়ে। পড়াশোনায় এমন গভীর মনোযোগ ছিল বলেই তাঁর গবেষণার ফল হিসেবে রচিত হতে পেরেছিল ঐ রাজ্যের ওলন্দাজ গভর্নরদের শাসনকালের ইতিহাস। এই তো মাত্র কিছুকাল আগে বই হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তা। তাঁর এই গবেষণাকর্ম সম্পর্কে অবশ্য নানা জনের নানা মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন কাজটা যতটা সুন্দর হওয়া দরকার ছিল ততটা হতে পারেনি। তবে এই গবেষণায় তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে সঠিক তথ্য হাজির করতে পারা। প্রথম প্রথম অনেকেরই মনে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যে অনেক গোলমাল রয়ে গেছে বলে সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখন আর কেউ তা মনে করে না। তাঁর কাছে পাওয়া তথ্যে সামান্য ত্রুটিমাত্র আছে বলেও মনে করে না কেউ। শুধু তাই নয়, ইতিহাস বিষয়ের সংকলনগুলোতে আজকাল রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে তাঁর লেখা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

কাজটা প্রকাশিত হবার অল্পদিনের মধ্যেই বুড়ো ভদ্রলোক মারা যান। আমরা এখন এই অবস্থায় যদি বলি যে, তিনি তাঁর শ্রমকে যোগ্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ কাজেই ব্যয় করেছেন, তাহলে তাঁর স্মৃতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রকাশ হবে। তিনি তাঁর নিজের মতো করে শখ মিটিয়েছেন। তাঁর প্রতিবেশীরা মনে করেন বিস্মৃতির ধুলো ঝেড়ে তিনিই সামনে এনেছেন পুরনো দিনের ইতিহাসকে। কোনো কোনো অনুরাগী-বন্ধু মনে করেন যদি তাঁর কাজে ভুলভ্রান্তি থেকেও থাকে তবে তার জন্য দুঃখ করা যেতে পারে, কিন্তু কোনো মতেই তাঁর ওপর রাগ করা ঠিক হবে না। জেনেবুঝে তিনি যে কাউকে আঘাত বা দুঃখ দিতে চাননি তা সহজেই অনুভব করা যায়। এখনো লোকেরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায়; এমনকি ঘোরতর সমালোচকেরাও বুড়ো ভদ্রলোকটির স্মৃতিশক্তির খুব তারিফ করেন। বেকারির লোকেরা নববর্ষের কেক বানাবার সময় তাঁর প্রতি সম্মান জানাতে কেকের মধ্যে তাঁর মুখের ছাপ আঁকে। তারা মনে করে ওয়াটারলু মেডেলের ছাপ অথবা রানি অ্যানের ফার্দিঙের চেয়ে তাদের এই শ্রদ্ধার জানানোর পদ্ধতিটি কম মর্যাদাপূর্ণ নয়।]

বুধবারের দিনটি হয়ে ওঠে
স্যাক্সনদের দেবতা ঔডেনের দিন।
সত্য বড় আপন জিনিস তাকে আমি,
সারাজীবন ধরে রাখতে চাই
এমনকি তা চাই শববাহী গাড়িতে চড়ে
কবরের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চলতেও।

হাডসন নদীর বুকে ঘুরতে গেলে সেখানকার অপরূপ পাহাড়ি দৃশ্যের কথা ভোলা যায় না।

সুবিশাল অ্যাপেলেশিয়ান পরিবারের শাখা ক্যাটস্কিল পর্বতমালার পাহাড়গুলোকে দেখা যায় হাডসন নদীর পশ্চিমদিকে চোখ ফেরালেই। ওদিকে তাকালে মনে হয় যেন দেশটাকে ঘিরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একদল বীর সৈনিক। ঋতু কিংবা আবহাওয়া বদলের প্রতিটি মুহূর্তে যেন কোনো এক অলীক জাদুর পরশে পাহাড়গুলোর রঙ বদলে বদলে যায়।

আবহাওয়া যখন মনোরম আর শান্ত থাকে তখন পাহাড়গুলো যেন নীল আর লালের ঘন ছোপ রঙ মাখানো চাদর মুড়ি দিয়ে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে পাহাড়ের চূড়াগুলো যেন ধূসর রঙ ধারণ করে। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি তখন যেন পাহাড়চূড়ায় গৌরবের মুকুট হয়ে ফুটে থাকে।

বেড়াতে আসা মানুষগুলো দেখতে পায় মায়াবী ঐ পাহাড়গুলোর গোড়ার দিকে গ্রামের বাড়িঘরের কাঠের ছাদ ও সবুজ গাছপালার মধ্য থেকে হালকা ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে। এখানেই গড়ে উঠেছে একটা ছোট্ট গ্রাম। খুব প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে ছোট্ট এই গ্রামটির। এই অঞ্চলে ওলন্দাজদের উপনিবেশ স্থাপনের গোড়ার দিকেই গড়ে উঠেছিল গ্রামটি। তখন ছিল পিটার স্ট্যুইভ্যাসান্ট-এর শাসনামল (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

প্রথমে যারা এখানে এসেছিল তাদের কেউ কেউ এই কিছুকাল আগেও বেঁচে ছিল। নিজেদের দেশের ফ্যাশন অনুসারে তারা বানিয়েছিল ঘরগুলো। এমনকি ছোট ছোট হলুদ রঙের ইটগুলোও নিয়ে এসেছিল হল্যান্ড থেকে। ঘরের সামনে আছে তিনকোণা বারান্দা। জানালাগুলো জাফরিকাটা। বাতাস কোন দিকে বইছে তা বোঝার জন্য তাদের দেশের নিয়মে সামনের বারান্দায় লাগানো আছে পিতলের তৈরি মোরগ।

এতক্ষণ গ্রামের যে-রকম ঘরের বর্ণনা দেয়া হল, সে-রকম অনেক পুরনো সময় ও আবহাওয়ার অত্যাচারে ক্ষয়ে যাওয়া একটি ঘরে অনেক দিন আগে রিপ ভ্যান উইঙ্কল নামে একজন মানুষ জন্মেছিলেন। তিনি ছিলেন একেবারেই শাদাসিধে স্বভাবের ও সুন্দর মনের মানুষ। তাঁর জন্মের সময় তাঁর দেশটা ছিল গ্রেট ব্রিটেনের অধীনস্থ একটা প্রদেশ। পিটার স্ট্যুইভ্যাসান্ট-এর গৌরবময় শাসনকালে বেশ নামডাক ছিল ভ্যান উইঙ্কল বংশের। পূর্বপুরুষদের রক্ত তাঁর

শরীরে বইলেও তিনি তাঁদের মতো যোদ্ধা হতে পারেননি। আমার মনে হয়েছিল তিনি ছিলেন খুবই সহৃদয় এবং সরল প্রকৃতির মানুষ এবং চমৎকার প্রতিবেশী; আর ছিলেন স্ত্রীর খুবই অনুগত। শুধু-যে স্ত্রীর কথা মেনে চলতেন তা নয়, সকলের কথাই তিনি মেনে চলতে চেষ্টা করতেন। নির্বিরোধী স্বভাব বলে আর স্ত্রীর কথা সবসময় মেনে চলতেন বলেই বোধ হয় তিনি সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কেবল ব্যতিক্রম ছিল একটি। কিছুতেই স্ত্রীর কাছে প্রিয় হতে পারেননি।

অথচ মজার ব্যাপার এই যে, গ্রামের অন্য সকল ভালোমানুষ বউদের কাছে তিনি ভীষণ জনপ্রিয় ছিলেন। যখন তারা ভ্যান উইঙ্কলদের পরিবারের সমস্যা নিয়ে গল্পগুজব করত তখন সকলেই একমত হত যে, রিপের কোনো দোষ থাকতে পারে না। তাদের সিদ্ধান্ত : সব দোষ রিপের বউ ড্যাম ভ্যান উইঙ্কলের।

রিপ ভ্যান উইঙ্কলের আরেকটি সুন্দর গুণ ছিল। ভারি মজার গল্প জানতেন তিনি। গ্রামের সব ছোট ছেলেমেয়েরা তাই রিপের বন্ধু। রিপকে আসতে দেখেই দূর থেকে ছেলেমেয়েরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য নানারকম কাজ করে আনন্দ পেতেন রিপ। তিনি তাদের সঙ্গে যোগ দিতেন খেলায়। খেলনা বানিয়ে দিতেন। ঘুড়ি ওড়াতে হয় কীভাবে, কীভাবে মার্বেল খেলতে হয় তা শিখিয়ে দিতেন ওদের। আর ভূতপ্রেত দৈত্যদানবের কত গল্প যে তিনি জানতেন তার শেষ নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের কাছে সেসব গল্প মজা করে বলতে ভারি আনন্দ হত তাঁর।

গল্প বলার জন্য যখন বেরুতেন রিপ তখন গ্রামের ছেলেমেয়েরা গোল হয়ে তাঁকে ঘিরে ধরত। তাঁর ঢিলেঢালা জামা ধরে ঝুলত কেউ-কেউ। কেউ আবার পেছনে ছুটতে ছুটতে তাঁকে নিয়ে মজার মজার ছড়া বলত। ছেলেমেয়েরা খুশিতে দল বেঁধে যখন পেছনে পেছনে ছুটত তখন বিস্ময়ে কুকুরও ভুলে যেত ঘেউ ঘেউ করতে।

এমন ভালোমানুষ রিপের কিন্তু একটাই দোষ ছিল। যেসব কাজ করলে টাকা উপার্জন হয় সেসব কাজে তিনি কখনোই সফল হতেন না। অথচ তাঁর ধৈর্যের কিন্তু অভাব নেই!

মাছ ধরার জন্য ছিপ ফেলে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বসে থাকতে বললে রিপ বসে থাকবেন। একটা মাছও যদি সারাদিনে বড়শির টোপ না খায় তাতেও রাগ নেই।

একটা পাখি মারার ছোট বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে বুনো ঘুঘু শিকারের আশায় সারাদিন বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতেন রিপ। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়-পর্বতের পুরোটা শেষ হয়ে গেলেও তাঁকে ফিরে আসাতে হত খালি হাতে।

পাড়াপড়শিদের আবদার তিনি ফেলতে পারতেন না। কেউ ধান মাড়াই করে দিতে অনুরোধ করলে সেই ধান মাড়িয়ে দিতেন হাসিমুখে। কারো চিঠি পৌঁছে দেয়ার জন্য মাইলের পর মাইল হাঁটতে হলেও ক্লান্ত হতেন না রিপ ভ্যান উইঙ্কল। এমনকি ভারী পাথর টেনে এনে পড়শির বাড়ির দেয়াল তুলে দেয়ার মতো কঠিন পরিশ্রমের কাজেও পিছু হটতেন না রিপ। অনেক সময় এমন সব তুচ্ছ কাজও তিনি করে দিতেন যা পড়শি মহিলাদের একান্ত অনুগত স্বামীরাও করতে চাইত না। শুধু নিজের পরিবারের কোনো কাজ এবং নিজেদের জমি রক্ষণাবেক্ষণ করতে বলা হলে কিছুতেই তাঁর উদাসীন ভাব কাটত না। তাঁর মনে হত এসব কাজ করা একেবারেই অসম্ভব।

রিপ মনে করতেন নিজের জমিতে কাজ করে কোনো লাভ নেই। সারাটা গ্রামের মধ্যে তাঁর নিজের ছোট্ট জমিটুকু ছিল সবচেয়ে অনুর্বর। তাঁর কেবলই মনে হত প্রাণপণে চেষ্টা করেও কোনো লাভ হচ্ছে না। কেবল আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে জমির অবস্থা। জমির চারদিকের বেড়াগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছিল দিনে-দিনে। পাড়া-প্রতিবেশীদের গরুগুলোও বেজায় পাজি হয়ে উঠছিল। যেন শুধু রিপের জমির বাঁধাকপিগুলোই তাদের প্রিয় খাদ্য। খেয়ে শেষ করে ফেলছিল সব বাঁধাকপি। আগাছাগুলোও দ্রুত বেড়ে উঠছিল। অন্যদের জমিতে কিন্তু অত আগাছা জন্মাতে দেখা যায়নি। রিপ যখন ভাবতেন জমিতে গিয়ে কাজ করবেন, ঠিক তখনই বৃষ্টি নামত ঝরঝর করে। যেন রিপের কাজে বাধা দেয়ার জন্যই এই বৃষ্টি।

ঠিকমতো জমির দেখাশোনা করতে না-পারায় এভাবে কমে আসতে লাগল রিপের জমি। বাবার আমলের জমি কমতে কমতে শেষপর্যন্ত ছোট্ট এক টুকরো জমিতে এসে ঠেকল। গম আর গোলআলু ছাড়া সেখানে অন্যকিছু ফলে না। অন্য সবার জমির তুলনায় যাচ্ছেতাইরকম বাজে জমিতে পরিণত হল সেটা।

রিপের ছেলেমেয়েরাও ছিল তাঁর জমির মতোই নচ্ছার। তাদের পরনে থাকত নোংরা জামাকাপড়। অলস আর বজ্জাত হয়ে উঠেছিল ছেলেমেয়েগুলো। কারো শাসনই মানত না তারা। ছেলে ছোট রিপও বাবার মতোই। সে বাবার পুরনো জামাকাপড় পড়ত। বাবার বদ-অভ্যাসগুলোই শিখে নেবার চেষ্টা করত শুধু।

রিপ ভ্যান উইঙ্কল ভীষণ বোকা আর আলসে ছিলেন বলেই এই জীবনটাকে এত সহজ ও আনন্দময়ভাবে নিতে পেরেছিলেন। তিনি এমনই একজন মানুষ যাঁর কাছে আরাম-আয়েস আর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনযাপনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শাদা রুটি বা বাদামি যেমনই হোক-না কেন যা পেতেন তা-ই খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন।

সেজন্যেই তিনি পৃথিবীর সেরা সুখী মানুষদের একজন।

যখন যা ইচ্ছে তা-ই হাতের কাছে পেয়ে গেলে মনের আনন্দে কাটত তাঁর দিন। কিন্তু তা হবার তো কোনো উপায় ছিল না। বউয়ের জ্বালায় একটুও শান্তিতে থাকার সুযোগ নেই। সারাদিন কাজে যাবার জন্য চেঁচামেচি করত বউ। রিপ যে একজন অলস আর অকর্মা মানুষ সেটা বলে গঞ্জনা দিত। বউ বলত এই অকর্মা লোকটার জন্য জীবনে তাদের মোটেও সুখ-শান্তি নেই। ছেলেমেয়েদের দুঃখকষ্টের শেষ নেই তার জন্য।

সকাল দুপুর রাত্রি বউয়ের মুখঝামটা থামত না একটুও। শেষমেষ এমন হল যে রিপ যা-ই বলতেন, যা-ই করতেন, তাঁর ভাগ্যে শুধু জুটত আরো বেশি বকুনি আর গঞ্জনা।

বউয়ের বকুনিতে অতিষ্ঠ হয়ে গেলে একটাই কাজ করতে পারতেন রিপ। ধীরে ধীরে তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল সেটা। তিনি কাঁধ ঝাঁকাতেন। যন্ত্রণায় মাথাটাকে কাত করে কাঁধের দিকে নুইয়ে চোখ দুটোকে বড় বড় করে তাকিয়ে থাকতেন আকাশের দিকে। কিন্তু কিছুই বলতেন না বউকে।

তাতেও স্বস্তি ছিল না! তাঁর এই চুপচাপ অবস্থা দেখে আরো রাগ চড়ত বউয়ের। শেষপর্যন্ত আর কোনো উপায় যখন থাকত না তখন একসময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তেন তিনি।

বাড়িতে রিপের বন্ধু ছিল একটাই। সে হল কুকুর উলফ। তিনি যেমন পছন্দ করতেন কুকুর উলফকে, তেমনি সে-ও ছিল খুবই প্রভুভক্ত। রিপের বউ এই

কুকুরটাকেও একদম পছন্দ করত না। তার মনে হত কুকুরটাও রিপের মতোই বজ্জাতের চূড়ামণি। একেক সময় মনে হত এই কুকুরটাই রিপের সকল দুরবস্থার জন্য দায়ী।

এমনিতে অন্য সব কুকুরের মতো রিপের কুকুর উলফও খুব সাহসী এবং জেদি। অনেক সময় সে অন্য কুকুরদের চেয়েও ভয়ানক সাহসী কাজ করে ফেলত। কিন্তু তা হলে কী হবে! যখন সে রিপের পেছন-পেছন বাড়ি ফিরত, তখনই রিপের মহাঝগড়াটে দজ্জাল বউয়ের সামনে পড়ে একটা আস্ত ভিতুর ডিম হয়ে যেত। তখন মনে হত এর চেয়ে অলস আর অকম্মা কুকুর বুঝি দুনিয়াতে আর একটিও নেই। কুকুরটাকে রিপের বউয়ের সামনে দেখলে মনে হবে সে যেন একটা ফাঁসির আসামি। তখন সে ঘন ঘন লেজ নাড়াত আর কুঁড়ের বাদশার মতো কেঁউ কেঁউ শব্দে ঘাড় বাঁকা করে তাকিয়ে থাকত। তাতেও নিস্তার নেই! রিপের বউ তাড়া করত ঝাঁটা হাতে নিয়ে। কোনো উপায় না-পেয়ে লেজ গুটিয়ে তখন বাড়ি থেকে পালাতে হত কুকুরটাকে।

যত দিন যেতে লাগল রিপ ভ্যান উইঙ্কলের অবস্থা ততই খারাপ হতে লাগল। বয়স বাড়লেও মানুষের মেজাজ নাকি চড়া হতে থাকে। রিপ ভ্যান উইঙ্কল সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়েও তাঁর করার কিছুই ছিল না। তিনি তখন সন্ন্যাসী-দরবেশদের মতো অলস মানুষগুলোর সঙ্গে বসে থেকে গল্পগুজব করে সময় কাটাতেন।

রিপদের আড্ডা বসত একটা ছোট্ট হোটেলের সামনের বেঞ্চিতে। হোটেলের দেয়ালের গায়ে রাজা তৃতীয় জর্জের একটা লাল রঙের ছবি আঁকা। রিপের সঙ্গীরা ছায়ায় বসে যে কী গালগল্প করতেন কোনো মাথামুণ্ডু থাকত না তার।

রিপদের সেই অজ পাড়াগাঁয়ে নিয়মিত কোনো সংবাদপত্র আসত না। কোনো পথচারী যদি কালেভদ্রে দু-একটি পুরনো খবরের কাগজ নিয়ে আসত তা নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। খবরের কাগজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁরা এমন সব কথা আলোচনা করতেন যা শুনলে হয়তো পণ্ডিতেরাও ভিরমি খেয়ে যাবেন। তাঁদের মধ্যে একজন মানুষ আছেন যাঁর নাম ডেরিক ভ্যান বুমেল। সকলে মনে করে এই আসরের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে জ্ঞানী। সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শোনে।

ডেরিক ভ্যান বুমেল একজন স্কুলশিক্ষক। ডিকশনারির সবচেয়ে লম্বা শব্দটিও তিনি টেনে টেনে সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতে পারেন। এত তাঁর জ্ঞান! কয়েক মাস আগের পুরনো হয়ে যাওয়া বিষয় নিয়ে ডেরিক ভ্যান বুমেল বড় বড় বক্তৃতা দেন। সবাই যে কী মনোযোগ দিয়ে তা শোনে সেটা যারা ওই আসরে একবার যায়নি তারা বুঝতে পারবে না।

যে হোটেলে রিপ ভ্যান উইঙ্কল আড্ডায় বসেন তার মালিকের নাম নিকোলাস ভেদার। তাঁর বয়স সবচেয়ে বেশি বলে তিনি ছিলেন এই আসরের মুরুব্বি। এই বুড়ো নিকোলাস সবার কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করতেন। গ্রীষ্মকালের দীর্ঘ অলস দিনগুলোয় সারাটা দিন দরজার সামনে বসে থাকতেন আসন পেতে। যদি রোদ লাগত একটু একটু করে সরে বসতেন গাছের ছায়ায়। অন্যরাও তখন সরে বসত তাঁর দেখাদেখি। বুড়ো নিকোলাসের সরে সরে বসা দেখে সময় মাপতে পারত সবাই।

তিনি অবশ্য খুব একটা কথা বলতেন না। কেবল পাইপ টানতেন বসে। তাঁর আবার ছিল একটা ভক্তের দল। তারা মনে করত প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তিরই একদল ভক্ত থাকে। এই ভক্তের দল সবসময় চেষ্টা করত তাঁকে খুশি করতে। অবশ্য কী বললে খুশি হবেন বুড়ো নিকোলাস সেটা তারা খুব ভালো করেই জানত। কোন পক্ষে তিনি মত দেবেন সেটাও জানা ছিল সবার। কোনো কথায় খুশি হলে পাইপ টানতেন ধীরে ধীরে। আর রাগ হলে পাইপ টানতেন খুব দ্রুত এবং জোরে। আসরের কথায় সায় থাকলে মাঝে মাঝে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তেন আর ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাতেন।

মাঝে মাঝেই অবস্থা হত খুবই খারাপ। এমন একটা সুন্দর আসরে বসে থাকবারও উপায় থাকত না রিপের। তাঁর বউ সেখানেও খুঁজতে চলে আসত। শুরু হয়ে যেত বকুনি। ফলে আড্ডার সবারই আনন্দ মাটি হয়ে যেত। নিকোলাস ভেদারের মতো এমন একজন গুরুগম্ভীর মানুষ পর্যন্ত থামাতে পারতেন না তাকে। বরং খেপে গিয়ে তাঁকেও বকতে শুরু করত রিপের বউ। বলত: বুড়ো নিকোলাসদের জন্যই রিপ দিনে-দিনে আরো অলস হয়ে উঠছে।

মনের দুঃখে এমন একটা আরামের জায়গা থেকেও পালাতে হত রিপকে। দুঃখে আর অপমানে কাতর হয়ে রিপ যেন এতটুকু হয়ে যেতেন। বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে তিনি চলতেন বনবাসে। সেখানে বউ নেই, কাজ করতে হত না কোনো। গভীর বনের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে শরীরে ক্লান্তি নেমে আসত এক সময়। তখনো তাঁর একমাত্র সঙ্গী থাকত উলফ নামের সেই প্রিয় কুকুরটা। সে-ও যে হতভাগ্য রিপের মতোই দুঃখী! রিপ বলতেন: 'বেচারা উলফ! তোর মালিকের বউ কী কষ্টটাই-না দেয় তোকে। কত খারাপ ব্যবহার করে। কুকুরের মতো জীবন তোর! যাক দুঃখ করিস না। আমি তো আছি। আমি যতদিন আছি ততদিন তোর বন্ধুর অভাব হবে না।'

কুকুর উলফ জবাবে তার লেজটা নাড়াত আর করুণ-চোখে তাকিয়ে থাকত প্রভুর দিকে। দুঃখ-কষ্ট বোঝার শক্তি যদি কোনো কুকুরের থাকে তাহলে একমাত্র রিপের কুকুর উলফেরই তা আছে। রিপের সব দুঃখের সাক্ষী সে। তাই প্রভুর দুঃখে সে-ও কাতর।

এমনি এক দুঃখের দিনে অনেকক্ষণ ধরে হাঁটতে থাকলেন রিপ ভ্যান উইঙ্কল। একসময় দেখলেন নদীতীরের পাহাড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের প্রায় চূড়ায় তিনি উঠে পড়েছেন। তখন ছিল শরৎকাল। প্রিয় শিকার কাঠবিড়ালির পিছনে ছুটতে ছুটতে এতদূর চলে এসেছিলেন তিনি। বন্দুকের

গুলির শব্দে ওখানকার নিঝুমতা ভেঙে যাচ্ছিল বারবার। বিকেল হয়ে এসেছে তখন। পাহাড়ের একেবারে চূড়ার দিকে একটু জায়গা সবুজ ঘাসে ছাওয়া। ক্লান্তিতে শরীরটাকে এলিয়ে দিলেন সেই ঘাসের উপর।

গাছের ফাঁক দিয়ে অনেক দূরে নিচু জমির উপর বাড়িঘরগুলোকে দেখা যাচ্ছে। খুব ছোট্ট আর সুন্দর লাগছে সে-দৃশ্য! হাডসন নদীকে অনেক অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে। যেন মনের আনন্দে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে নদীটা।

রিপ ভ্যান উইঙ্কল তাকালেন দূরের অন্য পাহাড়ের দিকে। অনেক অনেক নাম-না-জানা গাছপালায় ঘেরা সারি-সারি পাহাড়গুলোকে বুনো নির্জন আর ভয়াল

বলে মনে হল তাঁর। পাহাড়ের গোড়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছোট ছোট পাথরের ভাঙা টুকরো। এই শান্ত দৃশ্যের দিকে বেশ অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রিপ।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পাহাড়ের গোড়ার দিকে নীল ছায়া যেন গা এলিয়ে দিয়েছে। রিপ বুঝতে পারলেন, এত উঁচু থেকে নেমে গ্রামে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। তারপর ভাবলেন: এতদূর কঠিন পাথুরে পথ পার হয়ে ঘরে ফিরেও তো শান্তি নেই। চোখের সামনে ভেসে উঠল বদমেজাজি বউয়ের ভয়ঙ্কর মুখ। দুঃখে আর অভিমানে ভরে উঠল মন।

কিন্তু কী আর করা যাবে। ঘরে তো তাঁকে ফিরতেই হবে। বন্দুক কাঁধে নিয়ে পাহাড় থেকে নিচের দিকে নামবার প্রস্তুতি নিলেন রিপ। হঠাৎ মনে হল কে যেন দূর থেকে তাঁকে নাম ধরে ডাকছে: 'রিপ ভ্যান উইঙ্কল! রিপ ভ্যান উইঙ্কল!!' এদিক-সেদিক তাকালেন তিনি। আকাশে মাথার উপর দিয়ে ক্লান্তভাবে উড়ে-যাওয়া একটা কাক ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। ভাবলেন, হয়তো মনের ভুল। আসলে কেউ ডাকেনি। আবার নামতে শুরু করলেন।

কিন্তু আবারো শোনা গেল একই ডাক। এবারে শোনা গেল আগের চেয়ে আরো পরিষ্কারভাবে। কুকুর উলফও যেন হঠাৎ কুঁকড়ে গেল। একটু পরেই আবার সোজা হয়ে তাঁর পায়ের কাছে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। কুকুরের চোখেও ভয়! সে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল জোরে। রিপের মনেও ভয় ঢুকে গেল কিছুটা। যেদিক থেকে শব্দ শোনা গেল সেদিকে তাকালেন তিনি। দেখলেন অদ্ভুত কিছু একটা যেন ধীরে ধীরে উঠে আসছে পাহাড়ের চূড়ার দিকে। আরেকটু ভালো করে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন, একজন মানুষ পিঠের ওপর বেশ ভারী কিছু একটা নিয়ে চূড়ার দিকে উঠছে। এ-রকম একটা নির্জন জায়গায়, দুর্গম পাহাড়ি একটা এলাকায় এমন ভর সন্ধ্যাবেলা একজন মানুষকে দেখতে পাওয়া যাবে তিনি ভাবতেও পারেননি। কিছুক্ষণ পর মনে হল হয়তো কোনো প্রতিবেশী কোনো সাহায্যের জন্য এসেছেন তাঁর কাছে। ভেবে নামতে থাকলেন দ্রুত।

লোকটার কাছাকাছি এসে অবাক হয়ে গেলেন রিপ। খুবই বেঁটে লোকটা। দেখতেও অদ্ভুত! তাকে আগে কখনো দেখেছেন বলেও তো মনে হল না। লোকটার মাথায় একঝাঁক চুল, মুখে চকচকে কালো দাড়ি। পরনের কাপড়গুলো হল্যান্ডের পুরনো দিনের কাপড়ের মতো। গায়ের জ্যাকেটটাতে একটা বেল্ট লাগানো। প্যান্টটাও বেশ ঢিলেঢালা। লোকটা রিপকে ইশারা করল কাছে গিয়ে তাঁর বোঝা নামাতে সাহায্য করবার জন্য।

ভালোমানুষ রিপ লজ্জা পেয়ে গেলেন। এগিয়ে গেলেন তাকে সাহায্য করতে। রিপ আর সেই অদ্ভুত বেঁটেখাটো লোকটা মিলে বস্তা নিয়ে নামতে

লাগলেন। নামতে নামতে শুনতে পেলেন পাহাড়ের ওপরে বাজপড়ার মতো অদ্ভুত শব্দ। তিনি ভাবলেন এখানে তো মাঝে মাঝেই বজ্রপাত হয়। হয়তো সেইরকম বাজ পড়ারই শব্দ এটা! তাই আওয়াজে চমকে না গিয়ে তিনি নামতে লাগলেন। কিছুদূর নেমেই পাহাড়টা আবার উঁচু হয়ে গেছে। গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে আকাশ আর মেঘ দেখা যায়।

বস্তা টানতে টানতে এতক্ষণ কোনো কথা বলছিলেন না তাঁরা। এ-রকম একজন বেঁটেখাটো মানুষ কী করে এতবড় একটা বস্তা নিয়ে এত উঁচু পাহাড়ে

উঠলেন! ভেবে অবাক লাগল রিপের। একটু ভয়ও হতে লাগল। তবু তিনি এগিয়ে চললেন বেঁটে লোকটার সঙ্গে।

যে-জায়গাটায় নিচু খাদের মতো হয়ে আছে সেখানে তাকিয়ে আবারো অবাক হলেন তিনি। ওখানে বেঁটেখাটো আরো একদল লোক বসে একটা বল নিয়ে যেন খেলছে। লোকগুলোর পরনের পোশাকও অদ্ভুত! কেউ পরেছে ছোট্ট ঢিলেঢালা পাজামা। কারো গায়ের সেই জামার ঝুল অদ্ভুতভাবে ঝুলে আছে নিচের দিকে। তাদের প্রত্যেকের কোমরেই বেল্টের সঙ্গে ঝোলানো আছে ছুরি।

লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে আরো অবাক হলেন রিপ। অদ্ভুত তাদের মুখের গড়ন। কারো কারো মাথা শরীরের তুলনায় বড়, বেশ গোলগাল মুখ তাদের। কিন্তু চোখ দুটো খুব ছোট। কারো কারো আবার মুখ নাকের সমান। সবার মাথায় শাদা হ্যাট লাগানো। হ্যাটের গায়ে মোরগের ছোট্ট লাল পালক বসানো। সবার গালেই রয়েছে দাড়ি। নানা রঙের, নানা ধরনের।

একটা লোককে দেখে রিপ বুঝতে পারলেন যে সেই লোকটাই দলের নেতা। লোকটা বেশ মোটাসোটা। বয়সের দিক থেকেও সবার চেয়ে বড়। তার মুখের কুঁচকানো চামড়া দেখে বয়স যে বেশি তা বেশ বোঝা যায়। পাজামায় পাড় লাগানো। বেল্টটা অন্যদের চেয়ে মোটা। মাথায় রয়েছে পালক-লাগানো বেশ উঁচু একটা মুকুট। পায়ের মোজার রঙ লাল। জুতোটাও বেশ উঁচু। জুতোর সাথে লাগানো রয়েছে গোলাপ-ফুল। এরকম অদ্ভুত মানুষ কখনো দেখেননি রিপ ভ্যান উইঙ্কল।

বিস্মিত রিপ একবার ভাবলেন: এসব ঘটনা তিনি সত্যি সত্যি দেখতে পাচ্ছেন তো! নাকি অন্য কোথাও দেখা কোনো ছবির কথা মনে পড়ছে? নিজের গায়ে একটা চিমটি কাটলেন। ব্যথা পেয়ে আর কুকুর উলফকে দেখে নিশ্চিত হলেন ব্যাপারটাতে একটুও কল্পনা নেই।

কিছুক্ষণ অদ্ভুত লোকগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগল রিপের। দেখে মনে হল এরা খুব আমুদে লোক। অথচ সবাই খুব গম্ভীর হয়ে বসে আছে! আরো বেশকিছু সময় পার হয়ে গেল। কিন্তু কিছুতেই তাদের নীরবতা ভাঙল না। তারা শুধু মাঝে মাঝে বল গড়িয়ে অদ্ভুত যে-খেলাটা খেলছিল সেটা চালিয়ে যেতে লাগল। গুড়ুম গুড়ুম বজ্রপাতের মতো শব্দ হচ্ছিল বলের গড়িয়ে যাবার সময়।

রিপ ভ্যান উইঙ্কল এবং তাঁর অদ্ভুত সঙ্গী ঐ আজব লোকগুলোর একেবারে কাছাকাছি চলে আসতেই হঠাৎ থেমে গেল ওদের খেলা। সবাই রিপদের দিকে তাকিয়ে রইল পুতুলের মতো।

রিপ তাদের এই অদ্ভুত ব্যবহার দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। রিপের সঙ্গে যে-লোকটি এখানে এসেছে সে তার ভাণ্ড থেকে একটা বড় পাত্রে মদ ঢেলে দিল। ততক্ষণে ভয়ের চোটে রিপের দুই হাঁটুতে ঠোকাঠুকি চলছে। রিপের হাতে মদের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে তাঁকে বসতে বলল লোকটি। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসলেন রিপ। কিছুক্ষণ চুপচাপ মদ খেয়ে আবার খেলতে শুরু করল ওরা।

আস্তে আস্তে রিপের ভয় কেটে গেল। সবাই খেলায় ব্যস্ত। একই রকম নিশ্চুপ সবাই। কেউ-ই আর তাকিয়ে নেই তাঁর দিকে। এবার তিনি ভাবলেন মদের গ্লাসে চুমুক দেবেন। অনেকক্ষণ আগেই তেষ্টা পেয়েছিল। মদ খেতে খুবই ভালোবাসেন তিনি। এক চুমুকে অনেকখানি মদ খেয়ে ফেললেন। ধীরে ধীরে শরীরটা যেন ভারী হয়ে এল। এই মদের স্বাদ বেশ অন্যরকম। এমন মদ তিনি কখনো খাননি। চোখের পাতা দুটোকে আর মেলে রাখা যাচ্ছে না। শরীরটাকে একটু এলিয়ে দিতেই গভীর ঘুমের অতলে ডুবে গেলেন রিপ। শরীর ভেঙে এমন ঘুম এর আগে তাঁর কখনো আসেনি।

ঘুম থেকে জেগে রিপ ভ্যান উইঙ্কল দেখলেন তিনি শুয়ে আছেন সবুজ পাহাড়ের সেই জায়গাটায় যেখানে অদ্ভুত লোকটার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। দুহাতে চোখ রগড়ে চারপাশে তাকালেন তিনি। সকাল হয়ে গেছে। নানা ধরনের পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। চারপাশে সকালবেলার উজ্জ্বল আলো। মাথার উপর দিয়ে দু-একটা ঈগল উড়ে যেতে দেখা গেল। লম্বা লম্বা শ্বাস নিলেন তিনি। এমন পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নিলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। পাহাড়ের এই জায়গায় বয়ে চলেছে নির্মল বাতাস। রিপ ভাবলেন: আমি কি সারারাত এখানে ঘুমিয়েছি? ঘুম পাবার আগের ঘটনাগুলো মনে করবার চেষ্টা করলেন তিনি।

একে একে মনে পড়ে গেল সেই মদের ভাণ্ড কাঁধে নেয়া লোকটির কথা; পাহাড়, খাদ, পাথর আর সেই অদ্ভুত লোকগুলোর কথা। একে একে সবই মনে পড়ে গেল তাঁর। মনে পড়তেই অনুভব করলেন খুব খারাপ হয়ে গেছে ব্যাপারটা। এখানে এভাবে ঘুমিয়ে পড়াটা মোটেই উচিত হয়নি। বউয়ের রাগী চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই মন খারাপ হয়ে গেল। এর জন্য আজ অনেক গঞ্জনা সইতে হবে। কীভাবে বউকে বোঝাবেন তা ভেবে পেলেন না।

অদ্ভুত লোকগুলোর ওপর ভীষণ রাগ হল তাঁর। রাগ হল সেই মদের পাত্রটার ওপরও। কোন দুঃখ যে মদের স্বাদ চেখে দেখতে গিয়েছিলেন !

মনটা খুব বেশি খারাপ হয়ে গেল। বাড়িতে তো ফিরতেই হবে! এমন সুন্দর বাতাস, এত সবুজ গাছপালা আর পাখির ডাকের মিষ্টি শব্দ—কোনো কিছুই আর ভালো লাগছে না। বন্দুকটার খোঁজ করলেন। কেবল বন্দুক আর কুকুর উলফই তো সবচেয়ে ভালো বন্ধু তাঁর। কিন্তু তেল-চকচকে পরিষ্কার বন্দুকটার বদলে তিনি দেখতে পেলেন জংধরা একটা ময়লা বন্দুক পড়ে আছে পাশে। বন্দুকটার নলে জং ধরেছে, আর বাঁট খেয়ে ফেলেছে পোকায়।

এবার সন্দেহ জন্মাল মনে। ঐ অদ্ভুত লোকগুলো বোধহয় ছিল পাহাড়ের ভূত। আর নিশ্চয়ই সেই ভূতগুলোই মদ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তাঁর ভালো বন্দুকটা চুরি করেছে। কুকুর উলফকে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করলেন। তাকেও পাওয়া গেল না। রিপ ভাবলেন সে হয়তো তার প্রিয় শিকার কাঠবেড়ালির পিছু পিছু ছুটে বেড়াচ্ছে। এবার তিনি কুকুরটাকে ডাকার জন্য শিস বাজালেন। তাঁর শিসের ধ্বনি পাহাড়ের গায়ে লেগে অনেকগুলো প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল। কুকুরটার দেখা পাওয়া গেল না।

খুব রাগ হল রিপের। গতকাল যাদের সঙ্গে বসে মদ খেয়েছিলেন তাদের খুঁজে বের করতে হবে। কুকুর আর বন্দুকটা ফেরত চাইতে হবে। এ-কথা ভেবে তিনি হাঁটবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়ে অনুভব করলেন পায়ের গিঁটে গিঁটে ব্যথা। ভেবেছিলেন পাহাড়ের নির্মল হাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মোটেও ভালো নয়। বরং পাহাড়ের হাওয়া একরাতের মধ্যেই তাঁকে বেতো রোগী বানিয়ে দিয়েছে। গায়েও মোটেই জোর পাচ্ছেন না। একবার ভাবলেন: ভালোই হল, বেতো রোগী হলে বউ আর তাঁকে শুয়ে-বসে থাকার জন্য, মাঠে না-যাবার কারণে বকাবকি করতে পারবে না!

অনেক কষ্টে রিপ ভ্যান উইঙ্কল পাহাড়ের উপর থেকে বেশকিছুটা নিচে নেমে এলেন। তারপর তাকালেন চূড়ার দিকে। ওখান থেকেই আগের দিন সন্ধ্যায় সেই অদ্ভুত লোকটার সঙ্গে নিচের দিকে নেমে আসছিলেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে দেখলেন পাহাড়চূড়া থেকে কলকলিয়ে নেমে আসছে পানি। শুধু তাই নয়, পানি নামার কলকল শব্দ শোনা যাচ্ছে একদিক থেকে নয়, অনেক দিক থেকে। কোনো রকমে ঝোপঝাড়ের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে চললেন রিপ ভ্যান উইঙ্কল।

হাঁটতে হাঁটতে একটা খাদের কাছে এলেন। কিন্তু ওদিকে ঢুকতে পারলেন না। পাথরগুলো যেন দেয়াল হয়ে পথ আগলে রেখেছে। এখানে দাঁড়িয়ে আবার শিস

বাজালেন জোরে। কুকুর উলফের দেখা নেই। কিন্তু তাঁর শিসের শব্দে মরা গাছে বসে-থাকা কতগুলো কাক কা-কা করে ডেকে উঠল। এখন কী করবেন তিনি?

সকাল এগিয়ে চলেছে দুপুরের দিকে। খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট। কিছু খাওয়া দরকার খুব তাড়াতাড়ি। কুকুর আর বন্দুক হারিয়ে যাবার দুঃখে আবারো

মন খারাপ হল রিপের। পেটের খিদে স্থির থাকতে দিচ্ছে না তাঁকে। যে করেই হোক বাড়ি ফিরতেই হবে। বউকে ভয় পেলে চলবে না। মনে-মনে অনেক সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে চললেন রিপ। বাড়ি না-ফিরলে না-খেয়ে এই পাহাড়ি জায়গায় মরে পড়ে থাকতে হবে। কী আর করা! মরচে-পড়া বন্দুকটা কাঁধে নিয়েই তিনি ফিরে চললেন বাড়ির দিকে।

গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে একদল লোকের দেখা পেলেন রিপ। কিন্তু কী আশ্চর্য! কাউকেই চিনতে পারলেন না। অথচ ধারণা ছিল গ্রামের সবাই তার চেনা। লোকগুলোর পরনের জামাকাপড়ের ফ্যাশন দেখে আরেকটু অবাক হলেন। তাঁরা তাঁকে অবাক করে দিয়ে নিজেদের থুতনিতে হাত বুলোল। দেখাদেখি নিজের থুতনিতেও হাত বুলোলেন রিপ। আবার অবাক হবার পালা। রিপের থুতনির দাড়ি অন্তত কয়েক ফুট লম্বা হয়ে গেছে!

এরপর গ্রামের ভেতরে ঢুকলেন তিনি। একদল ছেলেমেয়ে হইহল্লা করতে করতে পিছু নিল তাঁর। ছাইরঙের এমন লম্বা দাড়ি দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করল গাঁয়ের কুকুরগুলোও। জোরে ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল। এ অবস্থায় পড়ে মনে হতে লাগল তাঁর বুঝি কোনো বন্ধু নেই। আশ্চর্য! গাঁয়ের একটাও পরিচিত মানুষের দেখা পাচ্ছেন না তিনি! পুরো গ্রামের চেহারাই যে বদলে গেছে! তা ছাড়া বেশ বড় লাগছে গ্রামটাকে! মনে হচ্ছে মানুষও সংখ্যায় অনেক বেশি। সারি সারি ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন! ঘরগুলোও বেশ অন্যরকম। গ্রামের মানুষগুলো একজন অন্যজনকে যেসব নামে ডাকাডাকি করছিল সেগুলোও বেশ নতুন। জানালা দিয়ে যাদের উঁকি-দেয়া মুখ দেয়া যাচ্ছে গতকালও এদের কাউকে দেখেননি রিপ। মনে হচ্ছে তাঁকে এবং এই পুরো গ্রামটাকে কেউ যেন জাদু করে সবকিছু উল্টেপাল্টে দিয়েছে।

আবার পাহাড়ের সারির দিকে তাকালেন রিপ। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এটা তাঁর গ্রাম! ওই তো চিরপরিচিত পাহাড়ের সারি! ঐ যে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে হাডসন নদী! এটা তাঁর গ্রাম না-হয়েই যায় না! কিন্তু কী করে সবকিছু এমন উল্টেপাল্টে গেল?

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ! দোষ দিতে লাগলেন নিজের ভাগ্যকে। গত রাতের মদের পাত্রটাই তাঁকে এই অবস্থায় ফেলেছে।

এদিক-সেদিক তাকিয়ে অতিকষ্টে গ্রামের পরিচিত পথটা খুঁজে পেলেন। সে-পথেই তিনি এগিয়ে চললেন কিছুটা। অবশ্য পথ চলতে ভয় হচ্ছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল যেকোনো মুহূর্তে কুচুটে-ঝগড়াটে বউ এসে তীব্রভাবে বকাবকির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তাঁর ওপর।

নিজের বাড়ির কাছে এসে দেখলেন বাড়িটা প্রায় ধ্বংস হবার পথে। ছাদ ভেঙে পড়েছে। জানালা-দরজাও একেবারেই ভাঙা। একটা রোগা কুকুর বাড়ির চারপাশে করুণভাবে হাঁটছে। বোঝা যাচ্ছে ঠিকমতো খেতে পায় না সে। একবার মনে হল ওটাই বোধ হয় তার প্রিয় কুকুর উলফ। তিনি আদর করে ডাকলেন তাকে। কিন্তু কুকুরটা দাঁত খিঁচিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গি করে চলে গেল। দুঃখে বুকের ভেতরটা যেন ভেঙে গেল তাঁর। হায়! প্রিয় কুকুর উলফও প্রভুকে চিনতে পারল না! লম্বা নিশ্বাস ফেললেন তিনি। চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু-ফোঁটা পানি। জীবনে কখনো এতবড় দুঃখ তিনি পাননি।

ঘরের ভেতর ঢুকলেন রিপ। ঘরটা তাঁর ঝগড়াটে বউ সবসময় সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখত। কিন্তু এখন সেটা খালি। কেউ থাকে না সেখানে। বউ-ছেলেমেয়েদের কাউকে না-দেখে ভীষণ ভয় হল তাঁর। করুণকণ্ঠে রিপ বউ আর ছেলেমেয়েদের নাম ধরে ডাকলেন কয়েকবার। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কিন্তু তাঁর করুণ কণ্ঠের ডাক আর কান্নার ধ্বনি ভাঙাচোরা খালি ঘরের মধ্যে কেবল ঘুরে বেড়াতে থাকল। কেউ সাড়া দিল না সে-ডাকে। হাহাকার করে উঠল রিপের বুকের ভেতরটা।

ছুটে গেলেন সেই প্রিয় সরাইখানাটার দিকে। কিন্তু সেটারও কোনো অস্তিত্ব নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট কাঠের ঘর, ঘরের জানালাগুলো সব বিরাট। দরজার ওপর ঝুলছে বিশাল এক সাইনবোর্ড: 'দ্য ইউনিয়ন হোটেল'। মালিক: জোনাথান ডুলিটল। নামটা খুবই অপরিচিত লাগল। অথচ এখানে বসে কতই-না সময় কেটেছে তাঁর।

পাশেই তো ছিল বিরাট গাছ! তার ছায়ায় বসে কাটত অলস সময়। কিন্তু এখন সে-গাছের কোনো পাত্তা নেই। এখন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাঁশ। বাঁশের মাথায় লাল রঙের টুপি পরানো। টুপির নিচেই উড়ছে একটা পতাকা। নিশানটায় আছে কতগুলো লম্বা ডোরাকাটা দাগ আর কয়েকটা তারা। অবশ্য রিপ একটা নকল ছবি দেখে চিনতে পারলেন। রাজা জর্জের এই ছবিটার নিচে বসে কত তামাক টেনেছেন তিনি। ছবিটার অনেক কিছুই বদলে গেছে। লাল কোটের জায়গায় এসেছে নীল কোট। হাতে রাজদণ্ডের বদলে একটা তরোয়াল, মাথায় মোরগের পালকের হ্যাট। নিচে বড় বড় হরফে লেখা: 'জেনারেল ওয়াশিংটন'।

রিপকে দেখার জন্য দরজা-জানালায় উঁকি-দেয়া অনেকগুলো মুখ দেখা গেল। কিন্তু হায়! তাদের কাউকেই চিনতে পারলেন না রিপ। তিনি জানতেন হোটেলের মালিক নিকোলাস ভেদার তাঁকে খুঁজবেন এদিক-ওদিক তাকিয়ে। এই

এলাকাটায় এত বেশি মানুষের কোলাহল ছিল না। বুড়ো নিকোলাস ভেদারকে না-পেয়ে খুঁজলেন ভ্যান বুমেলকে। স্কুলমাস্টার ভ্যান বুমেল বসে পাইপ টানত আর ধোঁয়া ছাড়ত। এদের কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না আজ। তাঁদের সবাইকে কতই-না ভালোবাসেন রিপ। অথচ এরা কেউ নেই এখন।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছিপছিপে একটা লোক। লোকটার পকেটে কতগুলো ছাপা কাগজ। হাত-পা ছুড়ে জোরগলায় বক্তৃতা দিচ্ছে লোকটা। বক্তৃতায় কতগুলো নতুন শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। লোকটা বলছিল নাগরিক অধিকারের কথা, ভোটের কথা, কংগ্রেস-এর সদস্য'র কথা। আরো কয়েকটা শব্দ তাঁর কাছে উদ্ভট লাগছিল। বাঙ্কারস হিল, ছিয়াত্তরের বীর, স্বাধীনতা—এইসব অদ্ভুত কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো এলাকার লোকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। অবাক হয়ে রিপও শুনতে লাগলেন সেই বক্তৃতা।

লম্বা দাড়িঅলা জংধরা বন্দুক কাঁধে অদ্ভুত বৃদ্ধকে দেখে হোটেলের লোকজন তাঁর পাশে এসে জড়ো হল। অবাক-হওয়া মহিলা আর ছোট ছেলেমেয়েদের একটা মিছিল যেন এসে জড়ো হল রিপের চারপাশে। তারা রিপের পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখছিল। যে-লোকটা অদ্ভুত নতুন কথা বলছিল সে-লোকটা একফাঁকে গলা নিচু করে রিপকে জিজ্ঞাসা করল,

'এই যে বুড়ো দাদু—আপনি কোন দিকে ভোট দেবেন!'

রিপ বোকার মতো তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন ফ্যালফ্যাল করে। তাঁর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলেন না। রিপ যখন এমন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তখন একজন বৃদ্ধলোক লাঠির ওপর ভর দিয়ে এগিয়ে এলেন। খুব রাগী চোখ মেলে তাকালেন রিপের দিকে:

'আপনি, আপনি বন্দুক কাঁধে নিয়ে দলবলসহ এই নির্বাচনের মিটিঙে কেন এসেছেন গোলমাল করতে?'

লোকটার ধমক খেয়ে প্রায় কেঁদে ফেললেন হতভাগ্য রিপ। বললেন: 'আমি একজন সামান্য মানুষ। রাজার হুকুম আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে চেষ্টা করি। ঈশ্বর তাঁর ভালো করুন।' রিপের কণ্ঠে ভয়।

এক লোক হঠাৎ বলে উঠল: 'এ নিশ্চয় গুপ্তচর। মারো একে!'

মুরুব্বি-মতো একজন অনেক কষ্টে রিপকে মার খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলেন। তিনি রিপকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন এখানে এসেছেন!'

হতভাগ্য রিপ কাতর গলায় বললেন: 'আমি আপনাদের কোনো ক্ষতি করার জন্য আসিনি। আমি এসেছি এখানে আমার প্রতিবেশী যে বন্ধুরা থাকেন তাঁদের খোঁজ করতে।'

মুরুব্বি ধরনের লোকটা জিজ্ঞাসা করলেন: 'কাকে আপনি খোঁজ করছেন, তাঁর নাম বলুন।'

একটু থেমে রিপ জিজ্ঞাসা করলেন:

'নিকোলাস ভেদার কোথায়?'

প্রশ্ন শুনে সবাই চুপ। ভিড়ের মধ্য থেকে বুড়ো একটা লোক বলে উঠলেন: 'নিকোলাস ভেদার তো মরে গেছে আঠারো বছর হয়ে গেল। ঐ তো গির্জার পাশে তাঁর কবর। বাঁধানো কবরের গায়ে যেখানে তার নামটা লেখা হয়েছিল সেটাও এতদিনে পচে গেছে।'

আরেকজনের নাম জিজ্ঞাসা করলেন রিপ: 'ব্রম ডাচার কোথায়?'

'সে তো যুদ্ধের শুরুতেই চলে গিয়েছিল যুদ্ধে। স্টোনি পয়েন্টের যুদ্ধে মারা গেছে। কেউ কেউ বলে, সে নাকি পাহাড়ের কাছে এক নালায় পড়ে ভেসে গেছে। অবশ্য কোনটা সত্য তা জানা যায়নি। যা হোক, কথা হচ্ছে সে আর ফিরে আসেনি।' বলল জটলার মধ্য থেকে এক ভদ্রলোক।

'স্কুলমাস্টার ভ্যান বুমেল কোথায়?'

'সেও যুদ্ধে গিয়েছিল। সেখানে সে মিলেশিয়া জেনারেলের পদও পেয়েছিল। এখন সে কংগ্রেসের খুব কেউকেটা লোক।'

সব কথা শুনতে শুনতে মন খারাপ হয়ে গেল রিপের। বন্ধুদের সবার পরিণতির কথা শুনে মন খারাপ হবারই তো কথা। বন্ধুরা এখন আর কেউ এই পৃথিবীতে নেই! এই পৃথিবীতে তিনি একদম একা! মনের কথা খুলে বলার মতো একজন মানুষও আজ নেই এই দুনিয়ায়! যা-ই তিনি জানতে চাচ্ছেন তার উত্তরেই শুনতে পাচ্ছেন দুঃখের খবর! আর কোনো আশা খুঁজে পাচ্ছেন না পৃথিবীতে।

সবার কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে অনেকগুলো বছর নাকি পার হয়ে গেছে এরই মধ্যে। ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। কিন্তু রিপ তার কিছুই বুঝতে পারছেন না। যুদ্ধ—স্বাধীনতা—কংগ্রেস—স্টোনিপয়েন্ট—কী সব নতুন কথা বলছে গ্রামের মানুষেরা।

রিপের মনটা দুঃখে এমন ভরে উঠল যে আর কোনো বন্ধুর কথা জিজ্ঞাসা করতেও ভয় হল। আর কারো কথা জিজ্ঞাসা করলেও হয়তো সেই একই উত্তর মিলবে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন রিপ :

'এখানে কি এমন কেউ আছে যে রিপ ভ্যান উইঙ্কল-এর নাম শুনেছে!'

ঝাপসা-চোখে এদিক সেদিক তাকালেন তিনি। এর উত্তরেও কি তিনি শুনতে পাবেন ভয়ঙ্কর কোনো সংবাদ! তিন-চারজন লোক মাথা নাড়ল তাঁর প্রশ্ন শুনে।

একজন বলল: 'হ্যাঁ শুনেছি। রিপ ভ্যান উইঙ্কলের নাম শুনেছি। এখানে একটা গাছ ছিল। তিনি নাকি তার নিচে শুয়ে-বসে সময় কাটাতেন।'

বলে হাত দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিল লোকটা। রিপও তাকালেন সেদিকে। হ্যাঁ ঠিকই তো। তিনি অলসভাবে বসে থাকতেন সেই গাছটার নিচে। নিজেকে একটা আস্ত বোকা লোকের মতো মনে হতে লাগল রিপের। যেন নিজের পরিচয়ই আজ নিজের কাছে বিশ্বাস হতে চাচ্ছে না। হ্যাট মাথায় দেয়া যে-লোকটি তাঁর সম্পর্কে কথা বলছিল সে-লোকটি জিজ্ঞাসা করল,

'আপনার নামটা জানতে পারি কী?'

রিপ বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন:

'ঈশ্বর জানেন কে আমি! আমি কি আর আমার মধ্যে আছি! জুতো পায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্য কেউ। গতকাল তো আমি আমিই ছিলাম। কিন্তু ঐ পাহাড়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওরা আমার সুন্দর বন্দুকটা বদলে একটা জংধরা বন্দুক রেখে চলে গেছে কোথায়—কে জানে। আমার নাম কী তা বলতে পারব না। আমি কে তা-ও বলতে পারব না।'

লোকগুলো একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। অনেকের মনে হল এই বুড়ো লোকটা নিশ্চয়ই পাগল! কেউ কেউ ফিসফিস করে বলল:

'লোকটার কাছ থেকে বন্দুকটা সরিয়ে নেয়া উচিত। কে জানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে বুড়োটা।'

ভিড়ের মধ্যে সবাই যখন অবাক-চোখে বাদামি দাড়িঅলা রিপকে দেখছে, তখন ভিড় ঠেলে এক সুন্দরী মেয়ে এগিয়ে এল। মেয়েটির কোলে ছিল একটা বাচ্চা। বাচ্চাটা তাঁকে দেখে ভয়ে কান্না জুড়ে দিল। মেয়েটি তখন বাচ্চাটাকে আদর করতে করতে বলতে লাগল: 'এই, কান্না থামাও। বুড়ো লোকটি তোমাকে কিচ্ছু করবে না।'

মেয়েটির কণ্ঠস্বর খুব পরিচিত মনে হল। শিশুটির নাম আর তার নাম তো একই। তখন রিপের মনে পড়ে গেল পুরনো কথা। রিপ জানতে চাইলেন মেয়েটির কাছে: 'কী নাম তোমার মেয়ে?'

'জুডিথ গার্ডেনিয়ার।' —জবাব দিল মেয়েটি।

'বাবার নাম কী তোমার?' আরো কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল সে।

'রিপ ভ্যান উইঙ্কল। কিন্তু তিনি আজ থেকে বিশ বছর আগে একদিন বন্দুক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আর ফেরেননি। কুকুর উলফ ফিরে এসেছিল একা। বন্দুক দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন নাকি

রেড ইন্ডিয়ানরা তাঁকে মেরে ফেলেছে—কেউ বলতে পারে না। আমি তখন খুব ছোট ছিলাম ।'

রিপের তখন মাত্র একটাই কথা জিজ্ঞাসা করা বাকি। মেয়েটির কথা শেষ হতে-না-হতেই দ্রুত জিজ্ঞাসা করলেন: 'তোমার মা কোথায়?'

'আহা, মাত্র ক'দিন আগে মারা গেছেন তিনি।'

এবার যেন একটু আনন্দ হল তাঁর। আর যেন তর সইল না। মেয়ে আর নাতিকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন: 'আমি তোর বাবা! একসময়ের যুবক রিপ, আমি কী করে যে একরাতের মধ্যে বুড়ো হয়ে গেলাম কিচ্ছু জানি না! আজ কেউ আমাকে চেনে না। আমি তোর বাবা রিপ ভ্যান উইঙ্কল!'

সবাই তো হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল! কথা শুনে এক থুত্থুরে বুড়ি তাঁর ভুরুর ওপর হাত রেখে বলে উঠলেন: 'আরে ঠিকই তো, এ তো দেখি সত্যি সত্যি রিপ ভ্যান উইঙ্কল! কুড়ি বছর ধরে কোথায় ছিলেন আপনি?'

রিপ ভ্যান উইঙ্কল সব ঘটনা বললেন। দীর্ঘ কুড়িটি বছর তাঁর কাছে মাত্র কি না একটি রাত! যে তাঁর এই কাহিনী শোনে সে-ই অবাক হয়। এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড কি ঘটতে পারে! জটলায় উপস্থিত লোকেরা হাসাহাসি করতে লাগল রিপের ঘটনা শুনে। কিছুক্ষণ পর কমে এল জটলা। সেই মুরুব্বি লোকটিও যেন রিপকে পেয়ে খুশি হয়েছেন। সবার হাসির সঙ্গে তাঁর হাসিও যোগ হল।

বুড়ো পিটার ভেনডারডঙ্ক হেঁটে আসছিলেন। তাঁকে দেখে ছুটে গেল সবাই। তাঁর এক পূর্বপুরুষ ছিলেন ইতিহাসবিদ। সেই পূর্বপুরুষটি এই গ্রামের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তাই এই গ্রাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন বুড়ো পিটার। গ্রামে অনেক কাল আগে বসবাস করতেন এমন অনেক মানুষের কথা তাঁর জানা। সকলে রিপের কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি চিনতে পারলেন রিপকে। রিপ যা যা বললেন সব বিশ্বাসও করলেন বুড়ো পিটার। তিনি বললেন: পূর্বপুরুষদের লেখা একটা বইয়ে নাকি ঐরকম অদ্ভুত বামুন মানুষগুলোর কথা লেখা আছে। হাডসন নদী আর এই গ্রামে প্রথম যিনি এসেছিলেন সেই হেনরিক হাডসন তাঁর জাহাজের নাবিকদের নাকি বলতেন ওই জায়গাটার দিকে ভালো করে নজর রাখতে। হাডসন নিজে নাকি ঐ অদ্ভুত বামুন লোকগুলোকে দেখতে পেয়েছিলেন। রিপ ভ্যান উইঙ্কল বাজপড়ার মতো যে-শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন হাডসনও নাকি শুনতে পেয়েছিলেন তা। বামন মানুষগুলো একটা বল নিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে খেলছিল। বলের গড়িয়ে যাওয়ার শব্দই অমন ভয়ঙ্কর।

বুড়োমানুষদের কাজই হচ্ছে পুরনো দিনের গপ্পো করা। কারো কারো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প শুনতে ভালো লাগল না মোটেও। একে একে কেটে পড়ল তারা।

রিপের মেয়ে ডেকে নিয়ে গেল রিপকে। বুড়ো বাবা এখন তার সঙ্গেই থাকবেন।

রিপ যখন মেয়ের ঘরের ভেতরে ঢুকলেন তখন মনে হল মেয়েটি তাঁর খুব লক্ষ্মী। কী সুন্দর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছে! মেয়েটির স্বামী গ্রামের একজন ধনী চাষি। সে যখন খুব ছোট্টটি ছিল তখন রিপ তাকে পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

একটা অলস ছেলে ছিল রিপের। সে-ও রিপের মতোই বসে থাকত গাছের গায়ে হেলান দিয়ে। তাকে একটা খামারে পাঠানো হয়েছিল চাকরি করার জন্য। কিন্তু সে সেখানে টিকতে পারল না। সবাই বলাবলি করে তার মধ্যে নাকি তার বাবার সবগুলো দোষ এসে জমা হয়েছে।

রিপ আবার নিয়মিত যেতে লাগলেন পুরনো আড্ডার জায়গাতে। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বেঁচে-থাকা বন্ধুদের কেউ কেউ এসে জুটল। গল্প-গুজব করতে লাগল তাঁর সঙ্গে। কিন্তু পুরনো বন্ধুরা সবাই খুব বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁরা অনেকেই আর একা-একা হাঁটতে পর্যন্ত পারেন না। তাই এখন জুটেছে অনেকগুলো নতুন বন্ধু। তাদের কাছ থেকে কুড়ি বছরের সব ঘটনা যতই শুনছিলেন ততই অবাক হচ্ছিলেন তিনি।

বৈপ্লবিক যুদ্ধ শেষে তাঁরা এখন স্বাধীন। অনেক দূরের দেশের রাজা তৃতীয় জর্জ আর এখন তাঁর দেশের রাজা নন। এখন তিনি স্বাধীন দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। রিপ মোটেও রাজনীতি বোঝেন না। রাষ্ট্রের এইসব পরিবর্তন তাঁর মধ্যে সামান্যই প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। রিপ সবচেয়ে খুশি হয়েছেন বউ বেঁচে নেই বলে। এখন আর কেউ আগের মতো রাতদিন তাঁর সঙ্গে শুধু রাগারাগি আর চেঁচামেচি করে না। এখন তাই খুব শান্তিতে আছেন।

যেখানে বসে আসর জমান, সেই মি. ডুলিটলের হোটেলের লোকদের সবাইকে রিপ তাঁর সেই বিশ বছর ধরে ঘুমাবার গল্প বলেন। গ্রামের ছেলেবুড়ো সবার মুখস্থ হয়ে গেছে রিপ ভ্যান উইঙ্কলের সেই গল্পটা। কেউ কেউ বলে: ডাহা মিথ্যা কথা বলেন রিপ। পুরনো মানুষ যারা, যারা হল্যান্ড থেকে এসেছিলেন তাদের অনেকেই অবশ্য রিপের কথা বিশ্বাস করেন।

যারা বউদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ, তারা ভাবে: আহা, তাদের যদি রিপের মতো একটানা বিশ বছর ঘুমিয়ে থাকবার উপায় হত!

পাদটীকা

কেউ ভাবতে পারেন এবং মি. নিকারবকারকে মনেও করিয়ে দিতে পারেন যে সম্রাট ফ্রেডেরিক এবং কিপহাউসার পাহাড়কে কেন্দ্র করে এতক্ষণ যে গল্পটা বলা হল এটা সম্পূর্ণ সত্য একটা ঘটনা। এ-কথাও বলতে পারেন যে, ডিয়েড্রিচ নিকারবকার এটা বর্ণনা করেছেন সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে। এমনকি জার্মানদের সংস্কার সম্বন্ধে কিছু তথ্য গল্পটার সঙ্গে অতিরিক্ত যোগও করে দিতে পারেন তাঁরা। রিপ ভ্যান উইঙ্কলের গল্প অসম্ভব মনে হতে পারে অনেকের কাছে। কিন্তু আমি এটা সম্পূর্ণভাবে' এবং সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি। কারণ আমি জানি আমাদের বুড়ো ওলন্দাজ অভিবাসী প্রতিবেশীরা বিস্ময়কর ঐ ঘটনাগুলো স্ব-চক্ষে দেখেছে। এর চেয়েও বিস্ময়কর গল্প আমি হাডসন নদী-তীরবর্তী গ্রামগুলোতে শুনেছি। খুব নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেই আমি পেয়েছি সবগুলো ঘটনা। এমনকি রিপ ভ্যান উইঙ্কলের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ সাক্ষাৎও হয়েছে। শেষবারে যখন

তাঁকে দেখি তখন তিনি একেবারে খুনখুনে বৃদ্ধ। কিন্তু তখনো তাঁর চিন্তা ছিল স্পষ্ট। এমন যুক্তিসঙ্গত ভাষায় তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন যে, যে-কোনো সচেতন মানুষই তাঁর কথায় নিশ্চিন্তে আস্থা স্থাপন করতে পারবেন। ঐ ঘটনা যে সঠিক সে ব্যাপারে সম্মতি জানিয়ে একজন বিচারকের নিজের হাতে স্বাক্ষর করা কাগজও দেখেছি আমি। শুধু তাই নয় স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রুশচিহ্নও আঁকা ছিল। সুতরাং এই গল্পটার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত না-হতে পারার আর কোনো কারণই থাকতে পারে না।

'ডি. কে'

পুনশ্চ.

মি. নিকারবকারের ডায়েরিতে ভ্রমণের খুঁটিনাটি বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্যগুলো নিম্নরূপ:

ক্যাটস্কিল পর্বতাঞ্চলে বা ক্যাটসবার্গ এলাকায় প্রচুর নীতিগল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রেড ইন্ডিয়ানরা মনে করে ঐসব অঞ্চল ভূত-প্রেতদের বাসস্থান। ওখানকার আবহাওয়াকে ভূতেরা নিয়ন্ত্রণ করে। তারা রোদের উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তোলে। মেঘ দিয়ে আকাশটাকে ঢেকে অন্ধকারকেও নামিয়ে আনে তারাই। শিকারের উপযুক্ত মৌসুম সৃষ্টি হয় তাদেরই দ্বারা। তাদেরকে পরিচালনা করে এক বুড়ি প্রেতিনী। ওখানকার লোকেরা বলে ঐ প্রেতিনীই হচ্ছে সব ভূতপ্রেতের মা। ক্যাটস্কিল পর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ে বাস করে সে। দিন এবং রাত্রির দরজা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠিও আছে তার হাতে। ঐ প্রেতিনীই ঠিক সময়ে দিন ও রাত্রির দরজা খোলে এবং বন্ধ করে। নতুন চাঁদকে আকাশে ঝুলিয়ে দেয়। বুড়ো চাঁদকে কেটে টুকরো টুকরো করে তারা বানিয়ে দেয়।

ঐ প্রেতিনী-মায়ের যদি মন ভালো থাকে তাহলে শুকনো মৌসুমে ভালো থাকে আবহাওয়া। হালকা মেঘরাশিকে পাকিয়ে পাকিয়ে ছড়িয়ে দেয় মাকড়শার বোনা জালের মতো। মেঘগুলো যেন ধুনুরিতে ধুনে নেয়া হালকা তুলো। শীতের ছেঁড়া ছেঁড়া শিশিরের মতো মেঘগুলোকে যেন ঐ প্রেতিনী পাহাড়ের চূড়ার উপর মুকুটের মতো বসিয়ে দেয়। সূর্যের উত্তাপ ঐ মেঘগুলোকে বৃষ্টির আকারে ঝরিয়ে না-দেয়া পর্যন্ত অপরূপ থাকে ওখানকার দৃশ্য। বৃষ্টি নামলে ওখানকার ঘাসগুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে লম্বা হতে থাকে। ফলগুলো পাকতে থাকে দ্রুত। ক্ষেতের ফসল প্রতি ঘণ্টায় কম করে হলেও এক ইঞ্চি লম্বা হয়। আর যদি কোনো কারণে জায়গামতো সে না থাকে তাহলে যে কী দুর্দশা নেমে আসে ঐ উপত্যকায় তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আকাশের মেঘগুলোর রঙ গাঢ় হতে হতে এমনই কালো হয় যে মেঘের রঙের সঙ্গে কালো কালির আর পার্থক্য থাকে না। ঐ প্রেতিনী আকাশের ওপর এমনভাবে ঝুলে

থাকে যেন একটা ভুঁড়িওয়ালা বিশাল মাকড়শা তার নিজের বোনা জালের মধ্যিখানে ঝুলে আছে।

বুড়ো রেড ইন্ডিয়ানরা বলে অনেক অনেক কাল আগে ওখানে ভয়ঙ্কর দুষ্ট এক প্রেত থাকত। লাল চামড়ার মানুষদের ভয় দেখিয়ে বিরক্ত করে পৈশাচিক উল্লাস পেত সে। কখনো কখনো সে একটা ভাল্লুকের আকার নিত; কখনো কালো চিতার, কখনো-বা হরিণের রূপ নিয়ে সে শিকারিদের বিভ্রান্ত করত। শিকারের সন্ধানে ছুটোছুটি করে ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যেত শিকারিরা। সেই সময় সেই প্রেত ভয়ঙ্করভাবে হো হো আওয়াজ করে লাফিয়ে পড়ত তাদের ঘাড়ের ওপর।

সেই প্রেতের প্রিয় বাসস্থান এখনো আছে। বিশাল আকারের এক পাথর আছে পাহাড়ের সবচেয়ে নির্জন ও দুর্গম এলাকায়। ফুলের লতানো গাছগুলো বেয়ে বেয়ে উঠছে। ওখানে যেন হাসি হাসি মুখ করে ফুটে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ বুনোফুল। ফুলগুলো গার্ডেন রক নামে পরিচিত। পাহাড়ের পায়ের কাছে ছোট্ট একটা হ্রদ আছে। ওখানে বারবার ফিরে আসছে একটা একাকী পাখি। জলবাসী সাপ রোদ পোয়াচ্ছে পানির উপর ভেসে থাকা পদ্মপাতার উপর। এই জায়গাটি সবসময় বিস্ময় জাগিয়ে রাখে রেড ইন্ডিয়ানদের মনে। এখানে সবচেয়ে শক্তিশালী শিকারিটিও তার কৌশলের সবটা প্রয়োগ করার সুযোগ পায় না। অনেককাল আগে এক শিকারি গার্ডেন রক-এর বনে শিকার করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। সেখানে গাছের ডালের গোড়ায় গোড়ায় অনেক পাহারাদার বসে থাকতে দেখতে পেয়েছিল শিকারিটি। তাদের মধ্যে একটিকে ধরেও ফেলেছিল। নিয়েও আসছিল সঙ্গে করে। কিন্তু দ্রুত পালিয়ে আসবার সময় হঠাৎ তার হাত থেকে পাথরের উপর পড়ে গিয়েছিল। একটা দমকা জলস্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হাডসনের দিকে। সেই হাডসনই এখন পর্যন্ত বয়ে চলেছে। ঐ জলস্রোতও বয়ে চলেছে এখনো। আর ক্যাটস্কিল নামে ঐ পাহাড়ের সারিকে লোকে এখনো চেনে।

www.alorpathsala.org
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.alorpathsala.org

আলোর পাঠশালা

School of Enlightenment

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি '**চিরায়ত গ্রন্থমালা**'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র